চন্দনের ছড়া পড়ে সুগন্ধি কুসুম,
অকালে পুষ্পটী ছিঁড়ে নিয়া গেল যম ॥
কে হেন সাবিত্রী আছে,তুলনা তোমার কাছে?
নারীকুলে শিক্ষা দিয়া ছাড়ি আত্মজন,
অন্নপূর্ণা গিয়াছ কি কৈলাস ভুবন?
তব মুখ মনে হলে ঝরে দু নয়ন,
কাকে দেব তোর সব ভাবি অনুক্ষণ।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

"হতাশ।"

হায় বিধি কি করিলে এত আশা কেন দিলে?
আশায় ভুলায়ে কেন রাখিলে আমায়।
এ ধনে কে চেয়েছিল এ প্রার্থনা কে করিল?
একবার দেখাইয়ে লুকালে কোথায়?
নাহি পাব যে রতনে লোভ দিলে কেন মনে,
হৃদয়ে হানিয়া শেল লইলে কাড়িয়া?
সে দিনের কথা যেন দেখিতেছি প্রতিক্ষণ,
সে কথা স্মরিলে প্রাণ যায় যে ফাটিয়া ॥
এমন করিবে বিধি জানিতাম আগে যদি,
দেখিতাম দিবানিশি সে চাঁদ বদন।
দারুণ শোকেতে হায়! পরাণ পাগলপ্রায়,
বিষাদ-সাগরে ডুবে আছি অনুক্ষণ ॥
পরাণের যত আশা যত আকিঞ্চন তৃষা,
আর কভু উঠিবে না হৃদয়েতে মোর।
যা'হ'বার হয়ে গেছে স্মৃতিটুকু পড়ে আছে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর ॥
কেন এত আশ্বাসিয়ে আশানল জ্বালাইয়ে,
অকালে সে আশাদীপ করিলে নির্ব্বাণ।
আর কি-হে পাইব না, এ জনমে দেখিব না
আবার কি পাব দেখা স্নেহভরা ধন?
ওহে হরি দয়াময়! দাও মোরে পদাশ্রয়,
সকাতরে ডাকিতেছি আমি হে তোমারে।
দুঃখিনী তনয়া বলে, পায়ে ঠেলে অবহেলে
জলন্ত অঙ্গারে ফেলে দিও না আমারে ॥
যে জ্বালাতে প্রাণ জ্বলে, তাহাতো নিভে না জলে,
নিভিবে না এ যাতনা থাকিতে জীবন।
যত সাধ মনে ছিল, সবত এবে মিটিল,
এখন তোমার আমি চাই শ্রীচরণ ॥
কাতর অন্তরে বলি দাও মোরে পদধূলি,
কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা মম হো'ক উপশম।
অন্তরেতে শোকানল, দাহ করে হৃদিস্থল,
পিঞ্জরেতে বদ্ধ আমি বিহঙ্গিনী সম ॥
একবার মনে হয় যেখানে দু চোক যায়
ছুটিয়া চলিয়া যাই শান্তি যদি পাই।
যথা নাহি ভালবাসা, নাহি সংসারের আশা
এমন সুখের ঠাঁই কোথাও কি নাই?
মনের বাসনা যত, একে একে হল গত,
এখন পড়েছি আমি অগাধ তিমিরে।
চারিদিক হোতে যেন, ঝড় বহে সন্ সন্,
নিরাশার মেঘ আসি ঘিরেছে আমারে ॥
হেন আশা দেখাইয়ে, এমায়ায় ভুলাইয়ে
উন্মাদের প্রায় মোরে কোরোনা হে হরি ॥
মিছামিছি দিয়া ধন কাঁদাও না আর প্রাণ
তোমার চরণে আমি এ প্রার্থনা করি।

ভগ্নপ্রাণা কুমকুম কুমারী।

দিনমণির প্রতি নলিনীর উক্তি।

কে তুমি সোণার থালা পূরবগগনে
উদিতেছ ধীরে ধীরে পুলকিত মনে,
গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় রক্তিম আকার ?
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।১

শৈলেন্দ্রশিখর হতে হইয়া স্খলিত,
অথবা উদয়াচল হইতে প্রেরিত—
মন্দ মন্দ ঊর্দ্ধ দিকে করিছ বিহার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।২

মধ্যাহ্নসময়ে আস যথা কেন্দ্রস্থল
মাধ্যাহ্নিক তেজঃপুঞ্জ প্রচণ্ড প্রবল ;
কেন্দ্রস্থল হতে আহা, চলিলা আবার
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৩

একি ! পুনঃ নিম্নগতি হেন ভাবান্তর—
প্রখর কিরণ তব এবে ক্ষীণতর ;
পশ্চিম গগন পানে গতি অনিবার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৪

আহা কিবা মনোহর ধরেছ মুরতি,
হাসিছে তোমায় হেরি মধুর প্রকৃতি,
আহা কি রূপের ছটা প্রাণি-প্রীতিকর !
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৫

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নকাল ; সোণার কিরণে
হাসিছে বিটপিদল প্রফুল্ল বদনে,
খেলিতেছে উর্ম্মিমালা উল্লাস অপার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৬

খেলিছ তরঙ্গ সনে ভাসায়ে কিরণ,
কি খুজিছ বারিগর্ভে হইয়া মগন ?
কে সেজেছ নানারঙ্গে বিবিধ প্রকার !
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৭

মন্দ মন্দ কোথা যাও ত্যজি অসময়,
অন্তরে তোমায় হেরি অন্তরেতে ভয়।
তুমিতো আমার নাথ ওহে দিনমণি,
আমিও তোমার প্রিয়া বিকচ নলিনী।৮

কিরণময়ী দেবী।

প্রাণের দেবতা।

কি তুমি বুঝি না আমি তবু বার বার
সাধ হয়, ওই পদে থাকি লুটাইয়া ;
সহস্র আঘাতে যবে ভাঙ্গিবে এ বুক,
দেখি যেন ওই মুখে অজস্র অমিয়া।
তুমি কি দেবতা মোর ? প্রাণের ঈশ্বর
অথবা উষার আলো ত্রিদিবের জ্যোতি,
ফুলের সুবাস কিংবা অমৃতের ধার
কি তুমি বুঝিতে মোর নাহিক শকতি!

আকাশে হীরক-কণা, নক্ষত্রের প্রায়
কে তুমি ঢালিলে আলো আঁধার হৃদয়ে,
নীরব কমলদলে ভ্রমরের মত
কেন দেও শত সুধা আননে ঢালিয়ে ?
যেখানে থাক না কেন হৃদয়-আধার !
আমার হৃদয়ে তুমি চির সমুজ্জ্বল
যত দিন মৃত্তিকাতে এ মাটি না মিশে,
ভাসিবে মানস-সরে শ্বেত শতদল।

কুসুমকুমারী দেবী।

No. 396. January, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৬ সংখ্যা। পৌষ ১৩০৪—জানুয়ারী, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট লাট—সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জী সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গের ছোট লাটের পদ পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন। লেডী মেকেঞ্জী আগামী মার্চ্চ মাসে আসিবেন।

রাজদর্শন—মর্হ্বির ঠাকুর মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া রাজপরিবারের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। তিনি রাজ্ঞী কর্ত্তৃক কে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

সুন্দর নিয়ম—নরওয়েতে এক আইন আছে যে, কোনও ব্যক্তি ৩টী চারা গাছ রোপণ না করিয়া সেই জাতীয় একটী বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিবে না।

চিন-জর্ম্মণ বিগ্রহ—চিনেরা ২ জন জর্ম্মণ পাদ্রীকে হত্যা করাতে এক জর্ম্মণ রণতরী কিয়াওচ নামক স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে। জর্ম্মণ সম্রাট্ যে ক্ষতিপূরণ চান, চিন সম্রাট্ তাহা দিতে অস্বীকৃত। যুদ্ধের সম্ভাবনা।

ভারত অতিথি—ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবরীর মাতা ক্লিবলণ্ডের ডচেস আর একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন।

কুচবিহারের সম্মাননা—গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউন হলে কুচবিহার মহারাজার অভ্যর্থনার্থ এক সায়ং-সমিতি হইয়াছিল, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হন।

গুণের পুরস্কার—ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক জগতে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বঙ্গদেশীয়

গবর্ণমেণ্ট উঁহার জন্য মাসিক ২০০ টাকা অতিরিক্ত বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ২২এ জানুয়ারী প্রাতঃকালে ৮টার সময় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইবে।

জাপানের সৈনিক ব্যবস্থা—জাপানের ব্যবস্থানুসারে ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষকে সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম আছে।

মৃত্যু—আমরা শোকার্ত্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মনোনীত সভাপতি এবং সমাজ-সংস্কারক ও নারীজাতির উন্নতি সংসাধক দলের অন্যতম অগ্রণী বাবু দুর্গামোহন দাস গত ৪ঠা পৌষ পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে বঙ্গমাতা একটী কৃতী পুত্র হারাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, বারিষ্টার, উকীল সকলে একত্র হইয়া ইহাঁর জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি যেমন একজন উপার্জ্জনশীল উকীল ছিলেন, সেইরূপ দেশহিতকর অনেক কার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। ইনি যে উইল করিয়াছেন তাহাতে বিবিধ সৎকার্য্যে অনেক অর্থ দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বামাবোধিনীর লেখক ও লেখিকা যশোহরনিবাসী উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভগিনী কুমুদিনী রায় এই উভয়েরও অকাল মৃত্যু সংবাদে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

প্রকৃত স্ত্রী।

জগতে কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেরই এক একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব যদি যথোচিত কর্ত্তব্যাচরণ করিত, তাহা হইলে সংসার কত সুখের হইত! নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য না করায় সুখময় সংসার দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দায়িত্বানুসারে সকল কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করা দূরের কথা, আমাদের উপর যে এক একটী গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, আমরা তাহা স্মরণও করি না। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যই সুখ দুঃখের ভিত্তি স্বরূপ। অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে সংসার যে দুঃখময় হইবে—"এ পাপ জীবনের অবসান কত দিনে হইবে" বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সংসারে আমাদের এক এক জন নারীর হস্তে আমাদের স্ব স্ব পতির জীবনের ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাকে সুখী করা ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মঙ্গল সাধন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে আর একটী

জীবনের ভার লওয়া কি কম দায়িত্ব? আর এক জনের সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া চলা কি সহজ কার্য্য? কিন্তু সে কার্য্য সহজই হউক, আর দুরূহই হউক, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং স্বামীর সুখের পথে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু হায়! আমরা এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারি না। পারি না বলিয়াই সংসারকে দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে সংসারেই স্বর্গ-সুখ লাভ করিতাম। যদি আমরা নিজ দায়িত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহাহইলে আমরা (স্ত্রীজাতি) প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিতাম। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী-জীবনে অধিকতর সুখ আর কি আছে? কিন্তু হায়! আমরা সে সুখের পবিত্র পথ অন্বেষণ করিতে যত্ন করি কই? সে সুখের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে শ্রম যত্ন চেষ্টা সতর্কতা ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্য গুলি আবশ্যক। কিন্তু আমরা এই দ্রব্য কয়টী ব্যয় করিতে সক্ষম হই কি? "না সহিলে ক্লেশ কোথা মিলেরে রতন" আমরা কি একবার একথা স্মরণ করিয়া থাকি? সতত আমরা যে সুখকে সুখ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে তাহা অসুখ ও অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের সুখের প্রথম পথ বিবাহ, দ্বিতীয় পথ স্বামী ও স্ত্রীর নিজ দায়িত্বানুসারে কার্য্য করা।

বিবাহ জীবনের প্রধান মহোৎসব। এই মহোৎসবে স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয় আনন্দ সলিলে ভাসমান হয়। কিন্তু আমরা যে মহোৎসবকে সুখের সোপান ভাবিয়া তাহাতে আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, সেই মহোৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে হৃদয় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত হয়। যাঁহারা এই মহোৎসবের গুরুত্ব বুঝিয়া যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য ও সুখী। বিবাহের পর মুহূর্ত্ত হইতেই মানব জীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজন অবলা রমণীর উপর একজন যুবকের সুখ শান্তি আশা ভরসা অর্থাৎ জীবনের সমস্ত নির্ভর, ইহা কি কথার কথা? যাহাতে স্বামীর সংসার সুশৃঙ্খল থাকে, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ লাভ করিতে পারে, স্ত্রীর পক্ষে তাহা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রমণী এই দুরূহ কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী। যে রমণী এই সকল কর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ, ঈশ্বর বা অগ্নি সাক্ষী করিয়া—ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ মন্ত্র পড়াইয়া স্বামীকে গ্রহণ করিলেও আমরা তাঁহাকে প্রকৃত স্ত্রী বলিতে বাধ্য নহি। প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়। হয় ত অনেক পাঠিকা ভগিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন "স্বামীকে ভালবাসে না, এরূপ রমণী জগতে অতি অল্পই আছেন।" কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, স্বামীকে ভালবাসেন এরূপ রমণীই জগতে অতি দুর্লভ। স্বামীকে ভালবাসিতে হইলে নিজের স্বার্থ বলি দিতে হয়, কিন্তু হায়! এই স্বার্থপর জগতে কয় জন রমণী নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাও, তাহা হইলে যে কার্য্যে তুমি সুখী হও, সে কার্য্য যদি তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র বিরক্তিকর হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিও। তিনি যাহা খাইতে ভাল বাসেন, তাহা খাওয়াইও, তিনি যাহা দেখিতে ভালবাসেন তাহা দেখাইও। মূল কথা সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মনোরঞ্জন করিও। যদি স্বামীকে ভালবাসিবে—প্রকৃত স্ত্রী হইবে, তবে নিজের সুখ দুঃখের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিও না। তোমার সুখ দুঃখের জন্য তোমার স্বামী দায়ী, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণ করিবেন, অতএব সে দিকে তোমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন কি? তুমি কেবল প্রকৃত স্ত্রী হইবার জন্য নিজের কর্ত্তব্যাচরণ করিয়া যাও। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী যেমন এক এক জনকে এক একটী আত্মীয় বলিয়া ভালবাসা যায়, স্বামীকেও তেমনি এক জন আত্মীয় ভাবিয়া সচরাচর রমণীগণ স্বামীকে ভাল বাসিয়া থাকেন। সচরাচর আত্মীয়দিগের সহিত তুল্য করিয়া স্বামীকে যে ভালবাসা যায়, সে ভালবাসাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যহেঁতে পারে না এবং স্বামীকে সেরূপ ভালবাসা অর্পণ করিয়া স্ত্রী কখনই প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারেন না। যে স্ত্রী স্বামীকে "সর্ব্বস্ব" বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন, "স্বামী ব্যতীত এ জগতে আমার অন্য আত্মীয় নাই" ভাবিতে পারিয়াছেন, যে স্ত্রী নিজের স্বার্থ বলি দিয়া নিজের সুখান্বেষণে বিরত হইয়া স্বামীর সুখ শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়। স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটী সম্বন্ধ। কোন্ সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর কোন্ প্রকার ভালবাসার অধিকারী এখন তাহাই বলিব। সম্মানের সহিত হৃদয়ে যে ভালবাসা জন্মে, তাহার নাম ভক্তি। সমতুল্য ব্যক্তির প্রতি যে ভালবাসা জন্মে, তাহার নাম প্রণয়। এইরূপ আমরা অনেক প্রকার ভালবাসা দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রীতি, প্রেম, প্রণয় ও ভক্তি এই চারিটী ভালবাসাকে আমরা প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি।

কি পুরুষ কি রমণী, সকলেই এই ভালবাসা এক এক জনকে এক একটী অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটী সম্বন্ধবশতঃ স্বামী একাই স্ত্রীর নিকট হইতে চারিটী ভালবাসার অধিকারী। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশাশি-সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী সম্বন্ধ; তৃতীয়তঃ সখ্য সম্বন্ধ, চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। অংশাশি অর্থাৎ শ্রম লাঘব করিবার জন্য যিনি কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য করেন,

তিনি অংশী। স্বামীর সহিত স্ত্রীর বাটনা বাটা, কুটনা কোটা ইত্যাদি কার্য্যের বিভাগ নহে। যে সকল কার্য্যের বিভাগ বশতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশি-সম্বন্ধ, সে সকল কার্য্য ছুরূহ অর্থাৎ যশ মান ধন জ্ঞান সুখ শান্তি ধর্ম্ম—স্বামী এই সকল কার্য্যেরই অংশিদার। যাহাতে সুখ শান্তি সন্তোষ উপার্জ্জন হয়, সে কার্য্য তুমি করিলে, যশ মান ধন জ্ঞান ধর্ম্ম—তোমার স্বামী উপার্জ্জন করিলেন; তোমার স্বোপার্জ্জিত সুখ শান্তি সন্তোষের অংশ স্বামীকে অর্পণ করিলে, তিনি তোমাকে তাঁহার উপার্জ্জিত যশমান ধন জ্ঞান ও ধর্ম্মের অংশ দান করিলেন, সুতরাং স্বামীর সহিত তোমার (স্ত্রীর) অংশি-সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর প্রীতির অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ সন্তানোৎপাদনের জন্য স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নামই স্ত্রী-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর প্রেমের অধিকারী। তৃতীয়তঃ সখা-সম্বন্ধ। মঙ্গলের জন্য যিনি সৎ পরামর্শ দান করেন, মানব যাঁহার নিকট হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দুঃখের কথা সুখের কথা কহিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে, তিনিই সখা। স্বামী স্ত্রীতে এই ভাবটুকু বিরাজিত থাকে, সুতরাং স্ত্রীর স্বামীর সহিত সখা সম্বন্ধ। চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অতি গুরুতর। এই সম্বন্ধ শুধু ইহ লোকের জন্য নহে, পরলোকেও এই সম্বন্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। মানব জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে মৃত্যুই গুরুতর পরিবর্ত্তন বলিয়া লক্ষিত হয়। অন্য সম্বন্ধ তিনটী ইহ জীবনের সহিত শেষ হয়—মৃত্যুর পর অনন্তে বিলীন হয়। কিন্তু শেষোক্ত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধটী মৃত্যুতে শেষ হয় না। এ সম্বন্ধ অনন্ত কালের জন্য। স্বামী স্ত্রীর প্রাণে প্রাণে ও আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা জন্মে, সেই ভালবাসার নামই আধ্যাত্মিক ভালবাসা বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই পবিত্র সম্বন্ধের অভাব, তাঁহারা প্রকৃত স্বামী স্ত্রী নহেন। "স্বামী একটী স্বতন্ত্র জীব ও আমি একটী স্বতন্ত্র জীব" যত দিন স্ত্রীর হৃদয় হইতে এই ধারণা অন্তর্হিত না হয়, ততদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের অভাব থাকে এবং ততদিন স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্য নহেন। যখন স্ত্রী বুঝিতে পারিবেন স্বামীর আত্মার সহিত আমার আত্মা অভিন্ন, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উদয় হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধ উদয় হইলে স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্য হন। " দেহের নাশ আছে, কিন্তু আত্মার নাশ নাই, সুতরাং আত্মায় আত্মায় ভালবাসার জন্য যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উদয় হয়, তাহা অনন্ত কালের জন্য অক্ষয় হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এই সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর পূজনীয় দেবতা স্বরূপ ও ভক্তির অধিকারী। যে স্ত্রী স্বামীর সহিত এই পবিত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য—

তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চ। রমণীকুল-শিরোমণি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদি রমণীগণ প্রকৃত স্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া আজও তাঁহাদের নাম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভগিনীগণ! ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা? তাই বলি প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চ। আইস ভগিনীগণ! আমরা সেই আসনে স্থান লাভের চেষ্টা করি। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী-জীবনে উচ্চতর সুখ নাই—রমণীর এ সুখ অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এই পবিত্র সুখটুকু লাভের জন্য যে শ্রম চেষ্টা যত্ন সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন, আইস ভগিনীগণ! নিজ নিজ স্বার্থ বলি দিয়া সেই টুকু শিখিতে চেষ্টা করি। প্রকৃত স্ত্রী হইয়া আর্য্য মহিলাগণ চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; আমরা যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও ধন্যা ও কৃতার্থা হইব।

ধর্ম্ম নীচগামী।*

ধর্ম্ম নীচগামী বলিয়া কোনও পুরাণে নাই। তবে কাব্য অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতরে আছে। আর শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ! পাসি যুগানুবৃত্তম্।
ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"

এই প্রমাণে কোন কোন পণ্ডিত ধর্ম্মকে—কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়া টানাটানি করেন। তা যাহাই হউক, কিছু কম ৪০০ শত বৎসর হইল মেদিনীপুরস্থ "দৌর" পরগণার মধ্যে জনার্দ্দন নামক জনৈক উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উপযুক্ত কালে তাঁহার পত্নীর গর্ভে সন্তান সন্ততি না হওয়াতে ব্রাহ্মণ সেই মনস্তাপে এই কলিকালে কোন্ দেবতার উপাসনা করিলে পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে, কোন এক অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অধ্যাপক মহাশয় তদনুসারে ব্রাহ্মণকে বলেন;—

"ধর্ম্ম চারিযুগ বর্ত্তমান। কিন্তু যুগে যুগে এক এক পাদ ক্ষয় হইয়া এক্ষণে এক পাদ ধর্ম্ম ছন্ন ভাবে সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি মনুষ্য-চক্ষের অগোচর। সেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক তেজোময় ধর্ম্মের আরাধনা করিলে অবশ্যই তোমার কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সাকার মূর্ত্তি পূজা ব্যতিরেকে বৈষয়িক বা ঐহিক কামনা পূর্ণ হইবার নহে। সাকার মূর্ত্তিতে ধর্ম্মের পূজা

* কোনও সাহিত্য সভার প্রশ্নমতে ধর্ম্ম যে কারণবশতঃ নীচগামী, তাহার কথা।

করিতে হইলে গণ্ডকী-নদী-জাত, ভূতভাবন ভগবানের যেরূপ শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি আছে, সেইরূপ খণ্ড প্রস্তরে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য।"

বিপ্রবর অধ্যাপক মহাশয়ের এইরূপ ব্যবস্থা ও উপদেশ লাভে অত্যন্ত প্রীত হইয়া একটা খণ্ড প্রস্তরে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীধর্ম্ম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত একমনে এক ধ্যানে প্রতিদিন তাঁহারই সেবা ও পূজায় রত হইলেন।

কিছু দিন পরেই দৈববলে বা শ্রীধর্ম্মের অনুগ্রহে তাঁহার পত্নীর গর্ভে এক এক বৎসরান্তর ৪টী পুত্র হয়। ব্রাহ্মণ পুত্র-মুখ সন্দর্শনে যারপর নাই আনন্দিত হইয়া আদরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামাই, মধ্যমের নাম নীলাই, তৃতীয়ের নাম সেতাই, ও চতুর্থ পুত্রের নাম কংসাই রাখিলেন।

রামাইয়ের বয়স যখন ৮ বৎসর ও অন্যান্য পুত্রের বয়স তদপেক্ষা ন্যূন, তখন ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পতি-পরায়ণা ব্রাহ্মণী পতির সহিত চিতারূঢ় হন।

নিঃসহায় বলিয়া ও অন্যান্য বিঘ্ন বশতঃ রামাইর উপনয়নের কাল গত হওয়াতে দেশের অধ্যাপকগণ উপনয়নের ব্যবস্থা দিলেন না এবং সেই কারণে রামাইর উপবীত সংস্কার হইল না। অসংস্থান প্রযুক্ত রামাই কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতারও যথাকালে উপনয়ন দিতে পারিলেন না—কেবল পিতার স্থাপিত শ্রীধর্ম্মকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহার সেবা ও পূজায় রত হইয়া কষ্টে সৃষ্টে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহা-দিগের গাঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাস ছিল।

ক্রমে সকলের বয়স যখন পরিপক্ক হইল, তখন তাহাদিগকে উপবীতহীন দেখিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ সকল "অপাংক্তেয়" অর্থাৎ একঘরিয়া করিলেন। সমযয়ে তাহাদিগকে লইয়া কেহই ভোজন করিতেন না এবং তাহাদিগকে কোন ব্রাহ্মণই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। অব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই অবজ্ঞা করিতেন। রামাই সেই মনো-দুঃখে এক দিন ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"হে ভ্রাতৃগণ! আমরা ব্রাহ্মণঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি পুরাণাদিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নানা কুচক্রে পতিত হইয়াও একমাত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কুরুযুদ্ধে জয় এবং স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃধর্ম্ম পালন আর ধর্ম্মপূজা করিয়া সমাজে আমাদিগের এতই শাস্তি! তবে আর ধর্ম্মপূজা করিবার প্রয়োজন কি? যখন ধর্ম্মের পূজা করিলে নীচ হইতে হয়, তখন এমন পাপ ধর্ম্মকে ঘরে রাখা উচিত নহে। যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ-ঔরসে আমাদিগের জন্ম হইয়া থাকে, তবে আমাদের অভিশাপে ধর্ম্ম অবশ্যই নীচগামী হইবেন।"

এই বলিয়া রামাই মনের ঘৃণায় ভ্রাতৃ-

গণের সম্মুখেই ধর্ম্ম ঠাকুরকে লইয়া "যাও তুমি নীচগামী হও" এই অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক নিকটস্থ সরোবরজলে প্রক্ষেপ করিলেন। যে দিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনের রাত্রেই সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রীধর্ম্ম দেব রামাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এই কথা বলেন ;—

"রামাই দুঃখিত হইও না ; আমি তোমাদেরই আরাধ্য। তোমার পিতৃদেবই মর্ত্ত্য লোকে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি তোমার অভিশাপ গ্রহণ করিলাম, অতঃপর নীচের গৃহে থাকিয়া নীচের পূজা গ্রহণ করিব। তোমরা আমার সেবা করিয়া কখনও পতিত হইবে না। উপবীতের পরিবর্ত্তে তাম্র-বলয় অথবা অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তে ধারণ কর, এবং তোমার ভ্রাতৃগণও তামা ধারণ করিয়া আমার পূজা করুক। শালগ্রাম শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে, সেইরূপ খণ্ড প্রস্তরে আমার মূর্ত্তি নিম্মাণ করিয়া ও এক এক নাম দিয়া নদ নদী জলাশয়ে এবং দেশ বিদেশে পরিত্যাগ কর। অধম, উত্তম, মধ্যম, যে কোন জাতি তাহা প্রাপ্ত হইবে, সেই আমার পূজা করিবে। যে আমার পূজায় অবহেলা ও প্রসাদ হেলন করিবে, সে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইবে। যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমি অবস্থিতি করিব, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তোমাদের ভক্ষ্য ভোজ্য ও কন্যাদি আদান প্রদান হইবে।

যদিও আমার ধ্যান ব্যতীত পূজার অন্য পদ্ধতি নাই, কিন্তু তোমাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভায় চতুর্ব্বর্ণেই আমার পূজা করিবে এবং ভবিষ্যতে আমার কৃপায় অনেক কবি জন্মিয়া গীতচ্ছলে ধর্ম্মপুরাণ প্রকাশ করিবে, পূজার পদ্ধতিও প্রচারিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ, মালাকার, কুম্ভকার, তেলী, তামলী, মোদকাদি নবশাক, আর বাগদী, ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি, রজক, জেলিয়া, দুলে, মালা, কলু, বাইতি, জুগী, কৈবর্ত্ত, মাঝি, মেটে, এবং অন্ত্যজ জাতি বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহারাও আপনাদের সাধ্যানুসারে যথাযোগ্য উপহার দিয়া আমার পূজা করিলে কোন প্রত্যবায় হইবে না। নেপাল রাজ্যের লোকেরা যেরূপে আমার পূজা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, বঙ্গেও আমার সেইরূপ পূজার অভিলাষ। তোমার নিকট এই সকল কথা প্রতিশ্রুত হইতেছি ; অন্যথা হইবে না। শীঘ্র আমাকে জল হইতে উদ্ধার কর।"

রামাই এইরূপ ধর্ম্মের স্বপ্ন দানে হাতে আকাশ ও প্রাণে ধর্ম্মের বল পাইয়া স্বপ্নভঙ্গে প্রাতঃকালেই কনিষ্ঠ ভাইদিগকে লইয়া সরোবর অন্বেষণপূর্ব্বক জল হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব মত সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া তাম্র-বলয় ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতাদিগকেও ধারণ করাইলেন।

অনন্তর, চারি ভ্রাতায় যুক্তি করিয়া খণ্ড প্রস্তরে (প্রস্তরফলকে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-

মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শান্তিনাথ, জলমাদল, চাঁদরায়, রাইবাঘিনী, কালাচাঁদ, রাজ্যধর, রূপরায়, মোহনরায়, যাত্রাসিদ্ধি, বাকুড়ারায়, খুদিরায়, দলুরায়, শ্যামরায়, স্বরূপনারায়ণ, হিরণ রায়, ফতে সিং, শীতল সিং, রাজবল্লভ, রাজাধিরাজ, জগৎ রায়, ঝুঝুরিরায়, খোড়ারায়, কালুরায়, খেলারাম, কাঁকড়া বিছা, শঙ্কাসুর, আঁধার ফুলী, প্রভৃতি সহস্র সহস্র স্থানে সহস্র সহস্র ধর্ম্মমূর্ত্তি সৃজন করতঃ, নদ নদী জলাশয়ে এবং দেশে বিদেশে পরিত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মের প্রত্যাদেশে যে সকল জাতি জল স্থল হইতে ঐ সকল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহারা আপন আপন গৃহে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন ও তাম্রবলয় ধারণ করিয়া ধর্ম্মের পূজা করিতে লাগিল। সেই হইতেই রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপূজা প্রচলিত হয় এবং ধর্ম্ম নীচগামী হন।

ইহার মধ্যে একটি কথা আছে; অনেক ধর্ম্ম-পণ্ডিত নিজ নিজ কর্ম্ম-দোষ এবং সেবাপরাধে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তাই, কথায় বলে যে, "ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নাই।" যাহার ঘরে ধর্ম্ম আছে তাহার ঘরে ২। ১ জন কুঠেও আছে। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

ধর্ম্মযজ্ঞ—এতদ্দেশে পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তিতে ধর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া একটা মহাসমারোহ পর্ব্ব হয়। সে যজ্ঞের ব্যাপার এই:—ধর্ম্ম যে কোন জাতির বাটীতে থাকুন না কেন, ঐ দিনে কোথাও খিচুড়ি, কোথাও অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস মৎস্যাদি, কোথাও পলায়, কোথাও পায়সান্নাদি রাশীকৃত প্রস্তুত হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতির বাটী হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ স্থানে লইয়া গিয়া ঐ ভোগ সমর্পণ করেন। যতই লোক উপস্থিত হউক না, কেহ প্রসাদে বঞ্চিত হইবে না। সেই দিন ধর্ম্মের দ্বার অবারিত। প্রসাদ বিতরণ কালে, গ্রাম্য লোকেরা অসংখ্য ঘটী বাটী ইত্যাদি পাত্র উপস্থিত করে। পাচক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পাত্রবিশেষে ভোগ প্রদত্ত হইলে শ্রীবিষ্ণু প্রসাদের ন্যায় "প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং"—লোকে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে। প্রসাদ হেলন করিলে মহাপাপ হয়।

পূর্ব্বে পূজার কোন পদ্ধতি-পুস্তক ছিল না। ধর্ম্মের অনুকম্পায় প্রথমতঃ ময়ুর ভট্ট সাধক কর্ত্তৃক পূজার পদ্ধতি-পুস্তক প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক সংস্কৃত নহে; কেবল ৭। ৮ পাতা ভাষা পুস্তক। উহার ভিতর কোন প্রসঙ্গ নাই, কেবল ধর্ম্মের স্তুতিপাঠ আছে মাত্র। ধর্ম্মের পূজারী অর্থাৎ পণ্ডিত তাহা অভ্যাস করিয়া ধর্ম্মের পূজা ও স্তুতিপাঠ করে।

তাহার পর দ্বিতীয় কবি এখান হইতে ১০ ক্রোশ ব্যবধান জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাইতি নিবাসী ৺ রূপরাম চক্রবর্ত্তী এবং এস্থান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান হুগলী জেলার অধীন পশ্চিমপাড়ানিবাসী তৃতীয় কবি দ্বিজ খেলারাম, চতুর্থ কবি

জেলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত বিজুড়নিবাসী ঘনরাম, পঞ্চম কবি কেতুগ্রামনিবাসী প্রভুরাম, ষষ্ঠ কবি দ্বিজ রামাই পণ্ডিত, সপ্তম কবি জেলা বাঁকুড়ার অধীন এখান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান গোকুলনগর চামচ্যানিবাসী ৺ রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম কবি এই স্থানের সমীপবর্ত্তী বেলডিহা-নিবাসী ৺ মাণিকরাম গাঙ্গুলী, নবম কবি এখান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান আহুড় নিবাসী ৺ মাণিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নয় জন কবিকৃত ধৰ্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ এতদ্দেশে প্রচারিত হয়। অন্যান্য দেশেও অনেক কবি জন্মিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন।

কবি মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত পুস্তকের বন্দনায় আছে;—

বন্দিব ময়ুর ভট্ট আদি, রূপরাম
দ্বিজ শ্রীমাণিক রচে শ্রীধর্ম্মপুরাণ॥

ইহাতেই বেশ উপলব্ধ হয় যে, ময়ুর ভট্ট আদি ও রূপরাম দ্বিতীয় কবি। তৃতীয় কবি খেলারাম, ইনি নিজ গ্রন্থ-সূচনায় লিখিয়াছেন;—

ভুবন শকে বায়ু, মাস শরের বাহন
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধৰ্ম্ম! এ দাসের পুরাও মনস্কাম
গৌড় কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি, গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব, সব পরিচয়॥

ভুবন ১৪, বায়ু ৪৯, মাস ধনু অর্থাৎ পৌষ মাস। ইহাতেই পাওয়া যায়, ১৪৪৯ শকের কিছু পূর্ব্বেই রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক বঙ্গে ধৰ্ম্মপ্রচার হইয়াছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন গ্রন্থখানি বহুদিন যাবৎ অত্রত্য শ্যামবাজার গ্রামের ৺ দলু রায় ধর্ম্মের খট্টাসনে বস্ত্রাবরণে গুপ্ত থাকিয়া ধৰ্ম্মপূজারী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ চন্দনচর্চ্চিত জলে সেঁতাইয়া গিয়া ভিতরের ও শেষের অনেক পত্র জমাট ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা উদ্ধারের কোন উপায় নাই এবং বহুস্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও উক্ত পুস্তকের আদর্শও নাই।

এতদ্দেশের গায়কগণ ঘনরাম, রামাই, মাণিকরাম ও রামচন্দ্রের কৃত ধৰ্ম্মমঙ্গল গীত শিক্ষা করিয়া ধৰ্ম্মপূজার উৎসবে গান করে। এতদ্দেশে (১) গ্রহভরণ, (২) পশ্চিমোদয়, (৩) ধৰ্ম্মগাজন (৪) সয়লা এই কয়েক প্রকার ধৰ্ম্মোৎসবে মহাঘটা ও ধৰ্ম্মপুরাণ অর্থাৎ পালাগীত হয়।

(ক্রমশঃ)

সন্তান পালন।

সন্তান পালন একটী গুরুতর কার্য্য। পিতা মাতার সাংসারিক শত শত দায়িত্বের মধ্যে এটী একটী গুরুতর দায়িত্ব। যে জনক জননী এই গুরু ভার বহনে অক্ষম, তাঁহারা পিতা মাতা পদের যোগ্য নহেন। সন্তান যাহাতে

সুশিক্ষা লাভ করে, নীতি ও ধর্ম্মকে মানবজীবনের সার বস্তু জানিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হয়, বাল্যকাল হইতে পিতামাতার সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তানগণ মাতার নিকটেই অধিকাংশ সময় থাকে, সুতরাং প্রত্যেক জননীই সন্তানের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। জননীর কার্য্যকলাপ ও চরিত্র দেখিয়া সুকুমারমতি সন্তান নিজ চরিত্র গঠন করে; সুতরাং সন্তানের ভাবী জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিমতী জননী বিশেষ সাবধানে নিজ কার্য্য সমাপন করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান বলেন যে, "আমার জ্ঞান ও উন্নতির এক মাত্র মূল আমার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা।" যে জননীর সত্যের প্রতি আদর নাই, বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা নাই তাঁহার সন্তান যে সত্যপ্রিয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে, ইহা আশা করা যায় না। অতি বাল্যকাল হইতেই সন্তানের চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে প্রহার দ্বারা সন্তানকে শাসন করেন। প্রহার দ্বারা সন্তানকে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত না করিয়া সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সৎপথে চালিত করা উচিত।

সন্তানকে সত্যপ্রিয় করিতে হইলে, পিতামাতাকে সর্ব্বপ্রকারে সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। ধার্ম্মিক সত্যপ্রিয় পিতা মাতার সত্যপ্রিয়তা ও ধর্ম্মভাব বাল্যকাল হইতেই যে সন্তানের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই সন্তান উত্তরকালে পিতা মাতার ও স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়।

সন্তানকে পাঠে অনুরাগী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। মহামতি সার্ উইলিয়ম জোন্স যখন বাল্যকালে কোন বিষয় জানিবার অভিপ্রায়ে জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন বুদ্ধিমতী জননী উত্তর করিতেন যে "তুমি পড়িলেই জানিতে পারিবে।"* বাল্যকাল হইতে জননীর নিকট কেবল পড়িবার কথা শুনিয়া তাঁহার পাঠের ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠে নিবৃত্ত হয়েন নাই। অনেক পিতা মাতা সন্তানকে পাঠে অনুরক্ত করিতে গিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, তাঁহাদের সন্তান কেবলমাত্র পাঠ করিবে, সে আর কোনও কর্ম্ম করিবে না। ব্যায়াম ও অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা শরীর যে সুস্থ ও সবল হয় এবং তাহার অভাবে যে শরীর দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা তাঁহারা অনেকে ভুলিয়া যান। সন্তানকে যেমন নীতি ও কর্ম্ম শিক্ষা দিবে, যেমন তাহাকে পাঠানুরাগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্যও সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাহার অঙ্গসঞ্চালনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সচ্চরিত্র, পাঠানুরাগী

*সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার বাক্য—"Read and you will know"—সন্তান যতবার কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিত, মাতার ঐ একই উত্তর।

বালকগণের সহিত সন্তান প্রতিদিবস রীতিমত সময়ে ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। কুসঙ্গ হইতে সন্তানকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। বালকগণের মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে বালকদিগের অন্তরে ভীরুতা প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সন্তানকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহসী ও দৃঢ় করিতে হইবে। একটী ইংরাজ মহিলা এক দিবস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়া হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তৎপরক্ষণেই সেই ঘোড়াতে আরোহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার ভ্রাতাকে চাবুক মারিবেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে "ইহাই আমাদের জাতীয় বল।" এ দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমাদের দেশীয় কোন ব্যক্তি সহসা কোন ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ঘোড়ায় চড়া দূরে থাকুক, তিনি জীবনে আর কখনও অশ্বারোহণ করেন কি না সন্দেহ। আর এক দিবস আমি একটী ইংরাজ মহিলার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছি, নিকটে তাঁহার একটী একবৎসর-বয়স্কা বালিকা খেলা করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখি যে, বালিকাটীর পশ্চাতে একটী কুকুরশাবক তাড়া করিতেছে। সে আমাদিগের চেয়ারের চতুর্দ্দিকে দ্রুতপদে ঘুরিতেছে এবং কুকুরশাবকও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। বালিকা অবশেষে জননীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে অমনি জননী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তুমি একটা কুকুরশাবকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমার সাহায্য চাও? তুমি মানুষ, উহাকে ঠেলা মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে পার না? ভীরু! তোমার এতটুকু সাহস নাই?"

৫ বৎসরের বালিকার প্রতি জননীর কি উক্তি!! আমাদের দেশ হইলে জননী দূর হইতে বালিকাকে বলিতেন— "পালা পালা, যেন কামড়ায় না।" সেই সংস্কারবলে আমরা একটা কুকুর দেখিলে দূরে পলায়ন করি। আমাদের দেশের জনক জননীগণ সন্তানগণকে অধিকতর দুগ্ধ খাওয়াইবার ও তাহাকে শক্ত করিবার ইচ্ছায় বাল্যকাল হইতে ভূত প্রেত প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া ফেলেন যে, ভবিষ্যতে তাহারা একটি স্থানে বাহির হইতে পারে না। সন্তানের নিকট সাহসিকতার দৃষ্টান্তপূর্ণ কাজ করিলে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়।

(ক্রমশঃ)

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৮৫ সংখ্যা—৩১৯ পৃষ্ঠার পর)

আয়ুর্ব্বেদমতে গোগণের চিকিৎসা।

গোগণের শৃঙ্গরোগে—শৃঙ্গবের, বলা ও মাংসকন্ধে সিদ্ধ সমাক্ষিক তৈল সৈন্ধব লবণ যোগে প্রদান করিবে।

সর্ব্বপ্রকার কর্ণশূল রোগে—মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ সহিত সিদ্ধ তৈল রসুন যোগে প্রদান করিবে।

দন্তশূল রোগে—বনমূল, অপামার্গ, পাটলা, ধাতকী ও কুটজ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া দন্তমূলে প্রদান করিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দন্তশূলহারক দ্রব্য সকল ঘৃতযোগে পাক করিলে তাহাই মুখরোগহারক ঔষধ হয়।

জিহ্বা-রোগে—সৈন্ধব লবণ প্রশস্ত। হৃৎশূল, বস্তিশূল, বাত ও ক্ষয়রোগে—গোগণকে ঘৃতমিশ্রিত ত্রিফলা প্রদান প্রশস্ত।

সর্ব্ববিধ কোষ্ঠরোগে এবং শ্বাস ও কাশ রোগে—শৃঙ্গবের ও ভার্গী একত্রে বাটিয়া সেবন করাইলে রোগ বিনষ্ট হয়।

ভগ্ন স্থান সংমিলনের নিমিত্ত লবণযুক্ত প্রিয়ঙ্গু বাটিয়া প্রলেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ভগ্ন-ক্ষত রোগে—হরিতালচূর্ণ, তৈল ও ঘৃত সহিত পাক করিয়া প্রদান করিবে।

ক্ষয়রোগে—মধুর সহিত ত্রিকুট সেবন করান উচিত।

মাসকলাই, তিল, গোধুম, ঘৃত এ সকলের পিণ্ড করিয়া লবণযোগে সেবন করাইলে বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়।

দেবদারু, বচা, জটামাংসী, গুগ্গুল, হিঙ্গু ও সর্ষপ এই সকলের ধূপ গোগণের হিতকর।

অশ্বগন্ধা, তিল ও নবনীত একত্র করিয়া সেবন করাইলে গাভীগণ ক্ষীরবতী হয়।

নিরন্তর গৃহে বাঁধিয়া রাখিলে যে বৃষ মত্ত হয়, তাহাকে হিঙ্গু খাওয়াইলে তাহার মত্ততা আরোগ্য হয়।

গোগণকে মধ্যে মধ্যে লবণ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থা।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে গাভীকে প্রসব করাইবার জন্য মনুষ্যকে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না, কেবল প্রসব হইবার সময় গাভীকে সমতল ও প্রশস্ত স্থানে রাখা উচিত, পাছে স্থানের সংকীর্ণতা ও উচ্চনীচতা প্রযুক্ত আঘাত লাগিয়া বৎসের অপকার হয়।

গাভীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে গৃহস্থকে একটু সাবধানে থাকিতে হইবে। যদি কিছু সাহায্য আবশ্যক হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

গর্ভ হইতে নিঃসরণকালে বৎসের পৃষ্ঠদেশ ঊর্দ্ধদিকে এবং দুইখানি আগ-

পায়ের মধ্যে নাসিকা থাকা, এই প্রকার অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা কহে।

গর্ভাবস্থায় গাভীকে পুষ্টিকর আহার দিয়া অত্যন্ত মোটা করা উচিত নহে। এই সময়ে গর্ভের শোণিত ও রসাদি সঞ্চালন বন্ধ হওয়াতে উদরে বেদনা হয়, তাহাতে গাভীর জীবননাশের সম্ভাবনা।

গর্ভ পূর্ণ হইবার সময় এই পীড়া কখন কখন উপস্থিত হয়। রক্তমোক্ষণ অথবা বিরেচন দেওয়া অপেক্ষা এই সময়ে কিছু আহার কম করিয়া দেওয়া উচিত। খৈল অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে বৎসের ঘূর্ণী রোগ হইবার সম্ভাবনা।

প্রসবকাল।

গাভী যদি সহজে প্রসব না হয়, তাহা হইলে অবসন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহাতে সহজে প্রসব হয়, তজ্জন্য মানুষের সহায়তা করা উচিত।

যিনি গাভীকে প্রসব করাইতে সহায়তা করিবেন, তাঁহার হাত ও বাহু গরম জল ও ঘি দিয়া মলিয়া নরম করিতে হইবে।

অসঙ্গত অবস্থায় বৎসকে নির্গত করা উচিত নহে।

বৎসের পা ধরিয়া টানিবার কালে সাবধানে থাকিবে, যেন তাহাকে কোন আঘাত না লাগে।

নাভী ছিঁড়িয়া গিয়া শোণিত নির্গত হইলে কোন ভয় নাই।

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড ১ম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে দ্বিজ সম্বোধিয়া আকিলিসে
বলিলা তখন—"দেবরাজ-প্রিয় তুমি
হে বীর-কেশরী আকিলিস! ইঙ্গিয়াছ
হইতে বিদিত—কেন ক্রুদ্ধ ফিবিয়াস
করেছে আনত তার কালমৃত্যুরূপী
ভীষণ কার্ম্মুক। কিন্তু বীর বলিবার
আগে এক ভিক্ষা—হও হে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
আজি মোর কাছে; আর ক্ষমতা বীরত্ব-
বলে তব আজি, করাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
নৃপতি-পুঙ্গবে। বলিব হে বীরবর
হেন গূঢ় কথা সব বিজ্ঞজন যাহা
লুকায়ে রাখিতে চায়, কিম্বা প্রকাশিব
সে সব কঠোর সত্য, যাহা নৃপতির
পক্ষে হবে নিঃসন্দেহ মহাগ্লানিকর।
জেনো বীরবর! ইহা অতি দুঃসাহস,
প্রজাগণ যদে, হয়ে সমধিক জ্ঞানী
দেয় উপদেশ নৃপতিরে, কোথা কোন
কার্য্যে তাঁর ঘটিয়াছে ভ্রম, প্রজার এ
দুঃসাহসে, সেই রোষানল জ্বলি উঠে
নৃপতি অন্তরে, যদিও ক্ষণিক বলি

তাহা মোরা ভাবি মনে, কিন্তু বীরবর !
জানিও নিশ্চয়, নরপতি অবশেষে
এ হেন দুঃসাহসের লন প্রতিশোধ।”
—বলিয়া এতেক যবে নীরবিলা বীর,
পিলিডাস* তবে সম্বোধিয়া ক্যালকাসে†
বলিলা তখন, “তব অন্তর হইতে,
অবাধে করহ ব্যক্ত, হে জ্ঞানিপ্রধান,
যাহা তুমি সবিশেষ আছ অবগত,
তব ওষ্ঠদ্বয়, যাইছে করিতে ব্যক্ত
যাঁর শুভবাণী, কিম্বা যাঁর নামে তুমি,
এনেছ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গ্রীকগণে হেথা,
দিবসের অধিপতি সেই আপোলোর
নামে আমি তব কাছে করিনু শপথ
অলংঘনীয়, যতক্ষণ আকিলিস-দেহে
বহিবে জীবনশ্বাস, এ অগণ্য গ্রীক-
দল মাঝে নাহি কারো এতেক সাহস
যেই হানিতে যাজকে হইবে সাহসী
কিম্বা রাজেন্দ্র আপনি স্পর্শিবে না কভু
হে যাজক ! তব ওই সুপবিত্র শির।”
এরূপ উৎসাহ লভি, ক্যালকাস তবে,
এইরূপে আকিলিসে করিলা উত্তর :—
“কাল মৃত্যুরূপী এই ভীষণ মড়ক
ঘটেনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গে, কিম্বা বলিদানে
মোসবার কোনরূপ অবহেলা হেতু।
নৃপতি আপনি করেছেন উত্তেজিত
জনধ্বংসকর এই ভীষণ মড়কে,
আপোলোর প্রতিহিংসারূপে মূর্ত্তিমান্
ক্ষতিগ্রস্ত যাজকের তরে জেনো সবে।
যদবধি নরপতি বিনা অর্থপণে,
অর্পিতে যাজকে তাঁর কুমিদা বালারে
প্রেরণ না করিবেন স্বদেশে তাহার,
তদবধি দেবরোষ, কিম্বা মহামারী,
কিম্বা ওই প্রবর্দ্ধিত চিতার অনল,
হবে না নির্ব্বাণ কভু। হয়ত মোদের
স্তুতি বন্দনায় আর পূজা বলিদানে,
পারেন যাজক পূজ্য, ক্ষমিতে তখন,
কিম্বা এই প্রায়শ্চিত্তে, কালগ্রাস হতে,
পারেন আপোলোদেব, সুপ্রসন্নচিত্তে,
অবশিষ্ট গ্রীকগণে দিতে অব্যাহতি।”
বলিয়া এতেক যবে নীরব যাজক,
ভীষণ ভ্রূকুটি করি, চমকি নৃপতি
উঠিলেন সমুজ্জ্বল সিংহাসন হতে,
পূরিল হৃদয় তাঁর দীপ্ত ক্রোধানলে,
ক্রোধভরে আঁখিদ্বয় জ্বলে ধক্ ধকি,
মহারোষে নরপতি দন্ত কড়মড়ি
গম্ভীর গর্জনে পুরোহিতে সম্বোধিয়া
করিলা উত্তর, “হে দৈবজ্ঞ এখনও
মো'সবারে তুমি দেখাইছ ভয় ঘোর
ভাবী অনিষ্টের, এখনও জ্ঞাতসারে
মম মর্ম্মভেদী বার্ত্তা করিছ প্রচার,
এখনও তুমি, পৌরহিত্য-গর্ব্বে মত্ত
হইয়া তোমার, উত্তেজিছ নৃপতিরে
হইতে কুপিত। ইহার কারণ তুমি
আপোলোর দৈববাণী করিছ প্রকাশ
শিখাইতে গ্রীকগণে নৃপতির প্রতি
এবে হইতে বিদ্রোহী, আর হে বিমূঢ়,
ইহার কারণ, অসত্য ভবিষ্য বাক্যে
তব, কলঙ্কিছ মোর রাজশ্রী—গৌরব,
দেবতা হয়েছে রুষ্ট, আর পুরোহিত

*আকিলিস।

†গ্রীক পুরোহিত ক্যালকাস, ইহাকে পূর্ব্বে ক্যালকান্ বলা হইয়াছে।

হয়েছেন হতমান এই সে কারণে
মোর পুরস্কার—মোর রূপসী বালারে
অর্পি নাই আমি, প্রদত্ত স্বর্ণ হ'তে
লাবণ্যের তার হইয়াছি সমধিক
অনুরাগী বলি। অতুলন সেই বালা—
সৌন্দর্য্য লাবণ্য গুণে, আর সুনিপুণ
সকল বিদ্যায়, ক্লাইনেসট্রার* রূপ
ছিলনাকো এতাধিক মনোমত মম
যবে সে প্রথম তার যৌবন বিকাশে
তুষেছিল মোরে। তথাপি দেবতাগণ
যাচে যদি তারে, মোরা প্রেরিব তাহারে
স্বদেশে তাহার, কারণ চাহি না মোরা
আপনার স্বার্থলাভ, কিন্তু জেনো চাহি
সবার মঙ্গল। মোরে সবে অশুভের
ঘৃণিত কারণ বলি কর়হে লাঞ্ছিত,
প্রজার নিধন হ'তে বরঞ্চ নৃপতি
সহিবেন ক্ষতি তাঁর যত। সদা আমি
তাজিব ও বন্দিনীরে মম, যেই এত প্রিয়,
আর ন্যায্যমতে আছিল আমার।
কিন্তু যবে সকলের মঙ্গল কারণ
অর্পিব তাহারে আমি, সকৃতজ্ঞচিত্তে
গ্রীকগণ সবে মোর এই ক্ষতি গুরু
করুক পূরণ। করেছেন তিনি বৃথা
রণ—বৃথা নিজ রক্তপাত বিনা পুরস্কারে
—দিওনা হে নৃপতিরে করিবারে হেন
অভিযোগে অগৌরবকর।" শুনি এবে,
নৃপতির এইমত উত্তর বচন,
জলদগম্ভীরে উত্তরিলা আকিলিস,
"হে অতৃপ্ত নরপতি! নিতান্ত ক্ষমতা-
প্রিয় তুমি, কিন্তু ততোধিক হে লোভার্ত্ত
হয় অনুরাগ তব পরস্ব হরণে।
ইচ্ছিছ নৃপতি তুমি, গ্রীকগণ সবে
অর্পিবে তোমারে, বহু ঘোরতর রণে
জয়লাভ তরে, উপযুক্ত পুরস্কার
রূপে ন্যায্যমতে যেই ধন সবে মিলে
লভেছে তাহারা, বহু রণক্ষেত্রে হত
বীর যোদ্ধা হতে, বহু হায়! নগরীর
বিলুণ্ঠিত ধন, করেছি গ্রহণ যাহা
সম অংশে মোরা, কাড়িয়া লইতে তাহা
করেছ মনন। এরূপ শঠতা জেনো
যথেচ্ছচারীর, ক্রীতদাসগণ শুধু
পারে সহিবারে। তথাপি মোদের যদি
নেতৃদলপতি বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির
তরে শুধু করেন সমর, তবে ওই
ইলিয়ন নগরীর বিলুণ্ঠিত ধন,
তাঁর ক্ষতি যত সব করিবে পূরণ,
যবে যোভের আদেশে মোদের বিজয়ী
এই সৈন্যদল বল উচ্চ দুর্গরাজি
তার করি ভূমিসাৎ, জয়কেতু উড়াবে গগনে।

(ক্রমশঃ)

* আগামেমননের পত্নী।

শেষ বিচার।

"আখেরে জানিবে বান্দা হিসাবের কালে।"

খৃষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন মনুষ্য এই পৃথিবীতে যে সকল কার্য্য করেন, এক দিন তাহার শেষ বিচার হইবে। তখন বিশ্বাসী অনন্তস্বর্গের অধিকারী

হইবেন এবং অবিশ্বাসী অনন্ত নরক দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা এরূপ কথা বলুন, না বলুন, মৃত্যুর পর মনুষ্যের যে পাপ পুণ্যের বিচার হইবে এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড বা পুরস্কারের ব্যবস্থা হইবে, এ বিশ্বাস কোন না কোন আকারে সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এইজন্য পরলোকে বিশ্বাস যেমন মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, ইহলোকের কর্ম্মের ফলাফল পরলোকে ভোগ করিতে হয়, এ বিশ্বাসও সেইরূপ স্বাভাবিক।

এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী, ন্যায়বান্ ও মঙ্গলবিধাতা। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, মানব এবং উচ্চলোকবাসী উন্নত দেবতা, সকলের উপরেই তাঁহার দৃষ্টি, সকলের প্রতি তিনি ন্যায়কারী এবং সকলের দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করিতেছেন। অচেতন বস্তু সকল অন্ধভাবে তাঁহার নিয়ম পালনে বাধ্য, এজন্য তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই। জড়, উদ্ভিদ এবং ইতর জন্তুতে এই বাধ্যবাধকতার ভাব দেখা যায়। কিন্তু মানবের অবস্থা অন্যরূপ। মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য পুরুষত্ব বা কর্ত্তৃত্ব শক্তি আছে। এইজন্য মানুষ আপনার ভালমন্দ কার্য্যের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের নিকট তাহার কার্য্যের হিসাব দিতে হইবে।

ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড হইবেই হইবে। কিন্তু ইহজীবনে কি তাহা সর্ব্বত্র সকল সময় সংঘটিত হয়? কত পাপাত্মা ঘোরতর পাপাচরণ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে ও গৌরবের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আর কত পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী ধর্ম্মরক্ষার জন্য অশেষ যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করিতেছেন! পৃথিবীর এই বিচার শেষ বিচার, কে এ কথা বলিবে? সামান্য মানুষ-রাজার রাজ্যে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন না হইলে সে রাজা দোষভাগী হইয়া থাকেন; আর মহারাজাধিরাজ বিশ্বরাজের রাজ্যে অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর ঠিক্ হিসাবকারী। তিনি মানবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য গণনা করিতেছেন, তাঁহার নিকট কিছুমাত্র ঢাকা রাখা যায় না। তাঁহার বিচারও তেমনি সূক্ষ্ম, এই জন্য "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" মানুষ বুঝিয়াছে। এই সূক্ষ্ম বিচারে ইহলোকে তিনি পাপপুণ্যের ফল বিধান করিতেছেন, আবার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তিনি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য আশ্চর্য্য। অমৃত বৃক্ষ যে রোপণ করিয়া পোষণ করে, তিনি তাহাকে বহুকাল কেবল কষ্টদুঃখ বহনের ভার দেন, কিন্তু পরিণামে অমৃত ফল দিয়া তাহার সকল

পরিশ্রম সার্থক করেন। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, সে আপাততঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী এবং যথাসময়ে হইবেই হইবে। মানুষ-বিচারকের বিচারে ভুল হয়;—কত সময় নির্দ্দোষীর দণ্ড ও দোষীর অব্যাহতি হইয়া থাকে, গুরু পাপে লঘু দণ্ড ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডও হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে ঠিক্ ওজন হয়; যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল বিচার হইয়া থাকে। তিনি চুল চিরিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করেন, তাঁহার বিচারে কখনও কোনও অন্যায়, ভ্রম বা পক্ষপাত হইতে পারে না।

"আখেরে জানিবে বান্দা হিসাবের কালে" এই বাক্যটী প্রত্যেক হিসাবদায়ী প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্যের মনে রাখা উচিত। ইহা মনে রাখিলে হিসাব করিয়া সকল কার্য্য করা যায়—যাহার প্রতি যাহা ন্যায়-সঙ্গত, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা যায়—অন্যায়াচরণে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা মনে রাখিলে জীবনকে ছেলের হাতের খেলার জিনিষ মনে করিয়া যেমন তেমন করিয়া ব্যয় করা যায় না। জীবন ঈশ্বরের অমূল্য দান. এই দানের সদ্ব্যবহারের জন্য আমি জীবনদাতার নিকট দায়ী। জীবনের এক মুহূর্ত্তকালের যদি অপব্যবহার করি, তাহার জন্য দণ্ড-ভাগী হইতে হইবে। যিনি কেবল ইহকালের বিচারক নহেন, পরকালেরও বিচারক, তাঁহার বিচারে খাঁটি থাকিতে পারিলে আর ভয় কি?—ভাবনা কি?

সকল ধর্ম্মই পাপীকে ভয় দেখাইয়া পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মৃত্যুর পর নরকভোগ বা তাদৃশ অন্য কোন ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর যেমন দণ্ডদাতা পিতা, তেমনি তিনি করুণাময়ী জননী। তিনি যে ইহকালের পরিমিত পাপের জন্য মানবাত্মাকে অনন্তকাল দণ্ড দিবেন, ইহা মনে করা যায় না। পিতা মাতার তাড়না যেমন সন্তানের সংশোধনের জন্য, তাঁহার দণ্ড ব্যবস্থাও পাপীকে পবিত্র করিয়া তাঁহার প্রেমক্রোড়ে লইবার জন্য। তথাপি পাপীর প্রত্যেক পাপের জন্য তাহাকে ধর্ম্মের দণ্ডাঘাত সহ্য করিতে হইবে, অনুতাপের তুষানলে পুড়িতে হইবে. এবং হৃৎপিণ্ড গলাইয়া অশ্রুর তর্পণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যত নরক-যন্ত্রণার ভীষণ বর্ণনা আছে, তাহার কোনওটীই আত্মগ্লানির যন্ত্রণার সমতুল্য নহে। মানুষ যে পাপ করে, যখন তাহার জন্য চেতনা হয়, তখন তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। যত পাপ স্মরণ, ততই গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্দাহ। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা। ইহকালে অনেক স্থলে হাতে হাতে পাপের ফল ভোগ হয় দেখা যায়, কিন্তু আবার অনেক স্থলে দেখা যায় না। এখানে মানব পাপের অসাড়তায় ও সংসারের মোহ কোলাহলে অচেতন হইয়া থাকে।

যে এখানে জাগিল না, যে এখানে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল না, বিচারপতি পরকালে তাহাকে জাগাইবেন এবং তাঁহার ন্যায় দণ্ড বিধান করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইবেন। অতএব সময় থাকিতে থাকিতে সকলে জাগ, এখানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাও, পরলোকে দণ্ডের হাত এড়াইবে এবং অপার সুখশান্তি ভোগ করিবে। পাপভারাক্রান্ত হইয়া যে পরলোকে যাইবে, বিচারপতির মহাবিচারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। সে বিচারকালে আর কেহ থাকে না "খোদা আর বান্দা" ঈশ্বর ও মানবাত্মা; ঈশ্বর বিচার করিয়া ফল বিধান করেন, আত্মা বিচারিত হইয়া যথোচিত দণ্ড ভোগ করে।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, একাকী স্বীয় দুষ্কৃতির ফলও ভোগ করিয়া থাকে।

কলালাপ।

(৩৯৫ সংখ্যা,—৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

২১। তণ্ডুল-কুসুম-বলি বিকার,—তণ্ডুল-ফুল-ফল-পত্রাদি দ্বারা নানাপ্রকার পূজোপহার নির্ম্মাণ করা। এখন দ্রব্যময় উপহার দ্বারা দেবপূজা করেন, এরূপ আচারী হিন্দু হিন্দুসমাজে অল্পই আছেন। ঈশ্বর-দত্ত পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করা এখন উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এককালে নানাবিধ উপাদেয় বস্তু দ্বারা পূজোপহার নির্ম্মাণ করা একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং তাহা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিতে হইত। খৃষ্টান্‌দিগের রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়মধ্যে পূজোপহার প্রদান-প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের আদিম প্রবর্ত্তক বোধ হয়, হিন্দুগণের পূজাপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। পূজাঙ্গরূপে হউক, না হউক, একটী পুরাতনী ও মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া এই কলাটীর পুনঃসংস্কার হওয়া মন্দ নহে।

২২। মণি-ভূমিকাকর্ম্ম,—বিবিধ বেশ-রচনা এবং কাচ, প্রস্তর স্ফটিকাদি দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ। বিবিধ বেশরচনা বিষয়ক ব্যাখ্যা আমরা, পূর্ব্বে করিয়াছি। মহাভারতের পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, ময় নামক কোন দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ময়-নির্ম্মিত সভাগৃহ কিরূপ আশ্চর্য্য ও মনোহর, তাহাও মহাভারতে বর্ণিত আছে। কুরুক্ষেত্রের যে মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয়

পাইয়াছিল, ময়নির্ম্মিত সভাগৃহই তাহার বাস্থ নিদান। ঐ সভাগৃহের মণিভূমিকায় মহারাজ দুর্য্যোধনের মহান্ ভ্রম জন্মিয়াছিল। জলভাগে স্থল ও স্থলভাগে জল ভ্রম হইয়াছিল। ভিত্তিতে দ্বার ও দ্বারে ভিত্তি বোধ হইয়াছিল। ভ্রমবশাৎ জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়াছিল, মস্তকে ভিত্তির আঘাত লাগিয়াছিল। মহাভারতে ইত্যাকার বর্ণনা আছে। দুর্য্যোধনের ঐ সকল ভ্রমবিজৃম্ভিত কার্য্য দর্শনে ভীমাদি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতে দুর্য্যোধনের অতিশয় ক্রোধ ও অভিমান জন্মিয়াছিল। এই ক্রোধ ও অভিমান হইতেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জন্মে। কপট পাশক্রীড়া ঐ প্রবৃত্তির ফল। ময়নির্ম্মিত সভাতলে দুর্য্যোধনের লাঞ্ছনা দর্শনে সভাস্থ সকলেই ভাবী মহানিষ্টের শঙ্কা করিয়াছিলেন। সেই দূরদর্শী ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের শঙ্কা বিফল হয় নাই।

এই মণিভূমিকাকর্ম্ম যে বর্ত্তমানে একবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ক্রিষ্ট্যাল্ প্যালেস" এবং রাজা বদ্রিদাসের মাণিকতলাস্থিত ঠাকুরবাড়ী ঐ বিদ্যার নিদর্শন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য প্রস্তরময় গৃহ ও দেবমন্দিরাদি আছে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ মণিভূমিকা কর্ম্ম নহে। ঐ বিদ্যাজাত গৃহাদিতে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। যদিও ঐ বিদ্যার বিশেষ প্রচলন এখন নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ ক্ষতিও নাই। তাদৃশ গৃহাদির নির্ম্মাণ কদাচ হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঐ বিদ্যাবিৎ লোকও খুঁজিয়া পাইবেন।

২৩। উদকবাদ্য—তাল সংযোগে বাদ্য। সপ্তদশসংখ্যক কাচের বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের তাল রক্ষা করিয়া কিরূপে তালতরঙ্গবাদ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তালপূর্ণ বৃহৎ পাত্র, মৃন্ময় বা ধাতুময় কলস ও হণ্ডিকা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে মৃদঙ্গাদির ন্যায় মধুর বাদ্যের সৃষ্টি হয়। এই বাদ্য ঢোলক, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ হইতেও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। এখন আর উহা প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা ঐ সকল যন্ত্র-বাদ্য শিক্ষা করেন, তাঁহারা অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার উদকবাদ্যের অনুশীলন করিতে পারেন। উহাতে ব্যয়াধিক্য বা কার্য্যসঙ্কট কিছুই নাই। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চমীমেলায় গীতবাদ্যের অনুশীলন যত অধিক হয়, ততই ভাল।

২৪। উদকঘাত,—জলস্তম্ভনী বিদ্যা। এই বিদ্যাপ্রভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা জলমধ্যে অবস্থান করা যাইতে পারে। মৎস্য ধারণ, মৌক্তিকাদি উত্তোলন, জলমগ্ন বস্তুর উদ্ধার এবম্বিধ কার্য্যে ঐ কলার সবিশেষ উপযোগিতা আছে। তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ঐ বিদ্যা দ্বারা বিপদ্ হইতেও আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তিকে দস্যু বা হিংস্র জন্তুতে আক্রমণ করে, আর তাহার ঐ বিদ্যা জানা থাকে, সে নিকটস্থ জলাশয়ে

প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রাণরক্ষা করিতে পারে। গদাযুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন! জলস্তম্ভনী বিদ্যার প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত ছিলেন। শুনা যায়, ঠগি-কমিসনার স্ল্যাকিয়ার সাহেবের শাসনকালে, অনেক অপরাধী জলমধ্যে আশ্রয় লইয়াও ধৃত হইয়াছিল। তাহারা জলস্তম্ভনী বিদ্যা জানিত না,—এক একটা সছিদ্র কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধহণ্ডিকা (কেলেহাঁড়ী) মাথায় দিয়া জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া দিন যাপন করিত। ঐরূপে লুক্কায়িত একটা দস্যু দৈবাৎ ধৃত হওয়াতে দস্যুগণের নবাবিষ্কৃত আত্ম-গোপন-কৌশল এককালে বিফল হইয়া যায়। ঐ বিদ্যা জানা থাকিলে তাহারা ধরা পড়িত না।

২৫। বিশেষকচ্ছেদ্য,—শারীরিক বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য দর্শনে মানুষের মানসিক সুখ সচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মনে সুখ থাকে না, তখন শারীরিক বেশবিন্যাস দূরে থাকুক, আহার বিহার শয়নাদি অপরিহার্য্য নিত্য কার্য্যও ভাল লাগে না। কিন্তু কলাবাপে দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ বেশ বিন্যাস ও শয়নসাচ্ছন্দ্য সম্পাদনার্থ কয়েকটী কলার সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক সুখানন্দের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা ধারাবাহিকরূপে সেই কলা কয়টীর উল্লেখ করিতেছি। "বিশেষকচ্ছেদ্য" এই কলাটীর অর্থ,—তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা। যাঁহারা প্রতিদিন আহ্নিক পূজার পূর্ব্বে দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

> "ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে,
> বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
> বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনম্
> ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
> শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশন্ত কন্ধরে।
> পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

ব্রহ্ম যে সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিলক-ধারণকালে দ্বাদশাঙ্গে অনন্তনাম ব্রহ্মের দ্বাদশটি নাম স্মরণ করিবার বিধি আছে। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে। চন্দন, গোপীমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি অনেকগুলি বস্তু দ্বারা তিলক ধারণ করা হয়। এই তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা করা বা নক্সা কাটার নাম বিশেষকচ্ছেদ্য। মনে প্রচুর পরিমাণে ভক্তি-রস না থাকিলে আর ঐ সকল কার্য্য হইয়া উঠে না।

২৬। কেশশিখরাপীড়যোজন,—বেণীরচনা, কবরীবন্ধন, চূড়াধারণ, কেশকুঞ্চনাদি দ্বারা মস্তকের বেশ বিন্যাস। রজত কনক দাম, পত্রকুসুম মাল্যাদির সংযোজনও উহার অন্তর্গত।

কাল সহকারে এই কলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঢাকা অঞ্চলের স্বর্ণকারেরা রমণীগণের বহুবিধ শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফুল, কাঁটা, ভ্রমর, প্রজাপতি, চিরুণী, বাগান ইত্যাদি। বিলাতী বিলাসিনীগণ যদিও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কেশকবরীতে কিছু ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের টুপিতে এই কলার চুড়ান্ত বিলাস দেখা যায়। কোন কোন মেম সাহেবের টুপির উপর এত লতা-পাতা-ফল-ভ্রমর-প্রজাপতি দৃষ্ট হয় যে বোধ হয়, যেন এক একটী বাগান মাথায় করিয়া চলিয়াছেন। আপীড় শব্দে পাখীর পাখা। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে হিন্দু রমণীগণ মস্তকে বিবিধ পক্ষীর পালক ধারণ করিতেন। এখন সভ্য মেমেরা ও অসভ্য রমণীরা পক্ষীর পালক দ্বারা মস্তকের বেশ রচনা করিয়া থাকেন।

২৭। কর্ণপত্রভঙ্গ,—শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী নামক টীকায় চতুঃষষ্টি কলার ব্যাখ্যা আছে। তাহাতে এই কলাটিকে কর্ণের চিত্রময় অলঙ্কার বলা হইয়াছে। কর্ণের ধাতুময় ও মণিমাণিক্যময় বিবিধ আভরণ ও তন্নির্ম্মাণের বিদ্যা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রময় আভরণত কিছুই দেখা যায় না। উড়েরা কাণে শ্বেত ও রক্তচন্দনের ২।৪ টা বিন্দু ধারণ করে এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কর্ণের নিম্নভাগে রক্ত চন্দনের এক একটী গোলাকার ফোঁটা ধারণ করেন, ইহাই দেখা যায়। ফলে এই কলাটীর অর্থ ভাল বুঝা গেল না।

২৪। শয়ন রচন,—পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ। যদিও খাট, তক্তপোষ, চৌকি, কোচ, নৌকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্ববর্ণিত তক্ষণের অন্তর্গত, তথাপি শুদ্ধ শয়নার্থ পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ একটি পৃথক্ কলার মধ্যে পরিগণিত। "একবিদ্যা সুশিক্ষিতা"। একজনে পাঁচ কাজ করিলে কোন কাজ ভাল হয় না। এই জন্য কেবল শয়নবিলাসিগণের শয়নাধার নির্ম্মাণার্থ একটী পৃথক্ কলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৯। চিত্রাযোগ—বিবিধ অদ্ভুত বিষয় প্রদর্শন। ছায়াবাজী, ম্যাজিক্, সহরবিন, নখদর্পণ ইত্যাদি ব্যাপার এই বিদ্যার ফল। রাত্রিকালে অল্পালোক-ভাসিত স্থানে বস্ত্রাবাস মধ্যে কাষ্ঠ, কাগজ, তালপত্রাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। সেই সকল ক্রীড়াশীল পুত্তলিকার ছায়া বস্ত্রে পতিত হয়। বহিঃস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার নাম ছায়াবাজী।

ম্যাজিকের প্রকরণ প্রায় ঐরূপ, কিন্তু উহা উচ্চ শ্রেণীর ক্রীড়া। ইহাতে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উপকার আছে। উহার সহিত খগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকায় উহা দ্বারা দর্শকগণের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, উল্কাপাত, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সকল ম্যাজিকে প্রদর্শন করা হয়। অনেক প্রাচীন ইউরোপীয় অধ্যাপক

এ বিষয়ে বিশেষ কৌতুকী ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে ম্যাজিক দ্বারা জ্যোতিষ ও খগোলের গুরুতর তত্ত্বনিচয় শিক্ষা দিতেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্ব্বতন ইন্‌স্পেক্‌টার (পরে ডিরেক্টর) উড্রো সাহেবের এ বিষয়ে বড়ই আমোদ ছিল। তিনি স্বসমকালীন অনেক হাই স্কুলে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উড্রো সাহেবের পর তাঁহারা কিছুদিন এখানে সেখানে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। এখন আর উহার বড় একটা আলোচনা দৃষ্ট হয় না। শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণ এই প্রয়োজনীয় কলাটির শিক্ষা ও আলোচনা বিষয়ে মনোযোগ করেন, ইহা নিতান্তই প্রার্থনীয়।

সহরবিনের প্রচলন উত্তমরূপই আছে বোধ হয়। পৃথিবীস্থ বড় বড় নগর, রাজধানী, পর্ব্বত, জলপ্রপাত, প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঝটিকা ও ভূকম্পকালীন প্রকৃতির অবস্থা, বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী, পৃথিবীর বিস্ময়কর সপ্ত পদার্থ, আধুনিক বড় বড় সেতু, লৌহ-বর্ত্ম, সমুদ্রে ঝড়, অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র-বন্যশূকর-গণ্ডারাদি শিকার,—ইত্যাদি বহুবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের আলোকচিত্র (Photograph) অণুবীক্ষণজাতীয় কাচ নলিকা দ্বারা প্রদর্শনের নাম সহরবিন্। অধিকাংশ হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীপুরুষ যেখানে সেখানে এক একটী পয়সা লইয়া উহা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক একটী পয়সা খরচ কাহারও গায়ে লাগে না,—অথচ উহার দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ হয়। বিশেষতঃ ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন-কালে মানচিত্র দর্শনে স্থান সন্নিবেশাদির যেরূপ স্থূল অভিজ্ঞতা জন্মে, সহরবিন্ দর্শনে বিশেষ বিশেষ বস্তুর একটু বিশেষ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। যিনি চিরকাল হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সীতকুণ্ড, জালামুখী, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র, নায়গেরা, বিসুবিয়স্, লণ্ডন, পারিস, প্রভৃতির নাম শুনিতেছেন,—কখনও দেখেন নাই,—দেখিবার আশাও নাই, তাঁহারা সহরবিনে কথঞ্চিৎ সেই সকলের বিন্দুমাত্র সংস্কারও লাভ করিতে পারেন। সহরবিন্ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থনিচয়ের বিচিত্র চিত্র দর্শন যে এত সহজ হইয়াছে, তাহা ইংরাজের গুণে,—দেশীয়দিগের তাহাতে কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। যাহাই হউক, যাহাতে ঐ কলাটী বজায় থাকে এবং তাহার ক্রমশঃ আরও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে ঐ মেলাস্থলে নানাস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সহরবিন্ আইসে এবং বহুসংখ্যক লোকে সচ্ছন্দে তাহা দর্শন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

নখদর্পণ নামক ব্যাপারটী এককালে এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। উহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। বোধ হয়, প্রকৃত

"চিত্রাযোগ", এই নখদর্পণ ক্রিয়ার পর্য্যবসান পাইয়াছিল। কেননা ইহার সহিত বাস্তবিকই একটু যোগবলের সংস্রব ছিল। এইরূপ শুনা গিয়াছে, যিনি যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার আপন দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখরদ্বয় মধ্যে, চিত্রাযোগ কলাবিৎ ব্যক্তি তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। উহার প্রকরণ এইরূপ ছিল;—দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ পাশাপাশি করিয়া আপন চক্ষুর উপর ধরিতেন এবং কলাবিদের উপদেশমত চিত্ত সংযত করিয়া ঐ নখদ্বয়ের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। কলাবিৎ তাঁহার নিকটে বসিয়া মনে মনে মন্ত্রাদি পাঠ ভিন্ন আর কিছুই করিতেন না। ক্রমে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি অভীষ্ট বস্তুর দর্শন পাইতেন। অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃপ্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অন্বেষণ, প্রোষিত পতির এবং সৈরিন্ধ্রীর গতি প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ, প্রয়াণ (যুদ্ধযাত্রা) কারীর শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়েই নখদর্পণ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। চোর অপহৃত দ্রব্যের সহিত কোথায় কি রূপে অবস্থান করিতেছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তি কোন্ দেশে কি করিতেছে, বিদেশী পতি বিদেশে এবং পতিবিরহিণী ভার্য্যা গৃহে কি করিতেছেন, যোদ্ধা রণভূমিতে কি অবস্থায় আছেন, ইত্যাদি বিষয় নখদর্পণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু "হস্তলাঘব" নাম্নী কলার বিষয় আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে, "নখদর্পণের" বিবরণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল কলার এককালে লোপ হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, এই জন্যই সত্য বিষয় সকল অসত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

পূর্ব্বকালে আমাদের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল সংসারেই কেমন সুখশান্তি ও ধর্ম্ম ভাব বিরাজিত থাকিত এবং সংসারধর্ম্মকেই তাঁহারা স্বর্গের সোপান বলিয়া জানিতেন। কেননা সংসারধর্ম্ম হইতে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করা যায়, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম হইতে হয় না। সদ্গুণের বশীভূত হইয়া সুচারুরূপে সংসার প্রতিপালন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের সময়ে সংসারধর্ম্ম এত সুখের ছিল ও প্রত্যেক গৃহস্থই একরূপ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। অশান্তি ও অসচ্ছন্দতা কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না এবং ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কখনও কোনও কর্ম্ম করিতেন না।

তাঁহাদের সময়ে মনুষ্যহৃদয়ে ধর্ম্মভয় বড়ই প্রবল ছিল। অধর্ম্মকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা ও ভয় করিতেন এবং সেই জন্যই সতত শান্তিতে বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়! এখন আমাদের অবস্থা কি হইয়াছে? আমরা আমাদের আর্য্যনারীগণের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ছাড়িয়া ভিন্নজাতীয় রীতি, নীতির অনুকরণ করিয়া কি অশান্তিতে বাস করিতেছি! আমাদের আর্য্যমহিলাগণ অপেক্ষা আমরা কত উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইংরাজী সভ্যতায় সকল বিষয়ে, ধনে, মানে, অর্থে ও বিদ্যায় আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কত উচ্চতর অবস্থা লাভ করিয়াছি এবং যথেষ্ট স্বাধীনতাও পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত আদর্শ সংসার করা দূরে থাকুক, কিরূপ রীতি নীতি অনুসারে চলিলে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সুখে বাস করা যায় এবং সংসার সুখের আগার হয়, তাহা আমরা জানি না বা জানিতে ও শিখিতে চেষ্টাও করি না। আমাদের শিক্ষার ও স্বাধীনতার এখন এই ফল হইয়াছে। স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এবং স্বাধীনতা পাইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া আপন পরিবারবর্গকে চিরসুখী করিবে। তাহা না হইয়া এখন আমাদের সংসারের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি কোন কোন শিক্ষিতা মহিলার সংসারের দুরবস্থা, বিশৃঙ্খলতা ও উদ্ধত স্বভাব হেতু গুরুজনদিগের মনঃক্লেষ্ট দেখিলে যথার্থই আক্ষেপ হয় এবং বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঘৃণার উদয় হয়। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করিবার অথবা পুরুষ সাজিবার জন্য নহে। যে মহাত্মারা আমাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। স্ত্রীশিক্ষায় অনেক উপকার আছে সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুরুষ হইলে সংসার সুখের হয় না। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া গুরুজনদিগকে সুখী করা এবং যত্নে পুত্র কন্যা পালন করা ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিজ নিজ সংসার যাহাতে আদর্শ পরিবার হয়, তাহার চেষ্টা করা। আদর্শ হিন্দু-সংসার বড়ই সুখের ও শান্তির এবং প্রীতির আগার। অতএব আমরা যদি এখনও সাবধান হই এবং আমাদের ধর্ম্মপ্রাণা পিতামহী, মাতামহীদিগের পবিত্র রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার শিখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আদর্শ হিন্দু সংসারে যে কি সুখ শান্তি ও সচ্ছলতা পাওয়া যায়, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আজ আমি উপস্থিত হইতেছি।

২৪ পরগণার অন্তর্গত এক গ্রামে সামান্য অবস্থার এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার মাসিক আয় ৩০্ মাত্র। ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোনও আয় অথবা পৈতৃক সম্পত্তিও

কিছু ছিল না। তাঁহার এই যৎসামান্য আয়ে অনেকগুলি প্রাণীর ভরণ পোষণ হইত। পরিবারমধ্যে তাঁহার ৫টি পুত্র ও ৩টি কন্যা, স্ত্রী ও একটি ভগিনী এবং নিজে, এই ১১টি প্রাণীর জীবনের সম্বল উক্ত ৩০ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী এমন মিতব্যয়ী ছিলেন যে, তাঁহাদের কোন কষ্ট না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। সংসার আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উক্ত গৃহস্বামী কথনও নিশ্চিন্তভাবে আলস্যে কাল কাটান নাই। যাহাতে পরিণামে সংসারটির সকল বিষয়ে মঙ্গল হয়, সেই জন্য সতত চেষ্টা করিতেন ও সকল সময় সেই সর্ব্বদুঃখহারী হরিকে স্মরণ করিতে ভুলিতেন না। একান্তমনে হরিকে ডাকিতে পারিলে তাহার ফল যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণের সংসার তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। ভাগ্যফলে ব্রাহ্মণ একটি সর্ব্বগুণশালিনী রমণীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহার অপরিসীম গুণে আজ তাঁহার সংসার আদর্শ হইয়াছে। স্ত্রীজাতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ ধর্ম্মভয়, লজ্জা, নম্রতা, শ্রমশীলতা, গুরুভক্তি, দয়া, এ সকল গুণ উক্ত রমণীতে ছিল। ইনি একজন ধনী ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। ধনীর কন্যা বলিয়া দরিদ্র স্বামীকে কথনও অবজ্ঞা করিতেন না। স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও অলৌকিক প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেন। স্ত্রীলোকের যে স্বামীই একমাত্র দেবতা ও গুরু, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এইজন্য ইহাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। স্বামী যখন যে বিষয় বলিতেন, স্ত্রী সানন্দচিত্তে তাহা সম্পাদন করিতেন। দম্পতীর মনের ঐক্য না থাকিলে সংসার সুখের হয় না। স্বামীর স্বল্প আয় বলিয়া উক্ত গৃহিণী কথনও অণুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেন না, স্বামীকে বাক্যজ্বালায় জ্বালাইতেন না। উপযুক্তা স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বামী সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন এবং যাহাতে সংসারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে সতত তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গৃহিণী ঐ অল্প আয়ে সংসারটি এমন করিয়া চালাইতেন যে,পাড়াপ্রতিবেশী সকলের দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। নিজের অথবা পুত্র কন্যাদের কাহারও বিলাসিতা এ সংসারে ছিল না। স্বামী বেতন পাইলেই তাহা গৃহিণীর হাতে সমস্ত দিতেন। গৃহিণী সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতেন। পরে সেই অল্প টাকা হইতে সর্ব্বাগ্রেই দান ধর্ম্মের নিমিত্ত ২ টাকা রাখিয়া বাকি টাকায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অল্প টাকা আয় বলিয়া নিজের সাহায্যের জন্য কোনও দাস দাসী রাখেন নাই। সমস্ত দিন নিজে পরিশ্রম করিতেন এবং যত্নে পুত্র কন্যাদের পালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিয়া আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নিজ

হস্তেই প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার শারীরিক কষ্টের কথা শুনিলে পাছে স্বামী মনে দুঃখ পান, এই জন্য কখনও তিনি স্বামীকে কষ্টের কথা বলিতেন না। স্বামী যদি কখনও কষ্টের কথা বলিতেন, স্ত্রী হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন এবং স্বামীর মন ভুলাইয়া রাখিতেন। বলিতেন আমাদের ভগবান্ যা দিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট, আমাদের অপেক্ষা কত দরিদ্র আছে, আহা! তাহাদের না জানি কত ক্লেশ হয়! আমার কোনও কষ্ট নাই, বেশ সুখে দিন চলিতেছে,—তুমি বৃথা দুঃখ করিও না। এইরূপ ভাবে স্বামীকে সতত আনন্দে রাখিতেন ও নিজেও সতত প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। তিনি একাকী সাংসারিক কার্য্য সকল এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করিতেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ও শত মুখে প্রশংসা করিত। গৃহিণী প্রত্যূষে ঈশ্বর ও স্বামীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। স্বহস্তে ঘর-গোবর, ছড়া, ঝাঁট, কাপড় কাচা প্রভৃতি গৃহকার্য্য সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক শেষে স্নান করিয়া রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতেন। স্নান করিয়া বাটীর একটি নির্জ্জন স্থানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন ও স্বামী পুত্রের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বমঙ্গলার নিকট মাথা খুঁড়িতেন। পরে স্বামী ও পুত্রদিগকে আহার করাইয়া কিছুকাল পরে আনন্দিতচিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া নিজে সর্ব্বশেষে শাকান্ন ভোজন করিতেন। উক্ত গৃহিণীর দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও অতিথিতে অত্যন্ত ভক্তি ছিল। যে কোন সময়ে হউক, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন এবং যতক্ষণ অতিথিকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না দেখিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। এক দিন দেখিলাম, বেলা ৩টার সময় একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া ইহাঁর বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মা, মা, বলিয়া চিৎকার করিতেছে। গৃহিণী কোন কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যেই তাঁহার কাণে উক্ত শব্দ গিয়াছে, তিনি অমনি সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সেই বৃদ্ধ লোকটির নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি চাও?" তখন বৃদ্ধ বলিল, "মা! আমি আজ দুই দিনের উপবাসী, আমার বাড়ী এখান হইতে ছয় ক্রোশ। এই গ্রামে এক জন বৈদ্য আছেন, তাঁহারই নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তাই তোমার বাড়ী আসিয়া পড়িলাম, আমাকে একটু আশ্রয় দাও ও একটু জল দাও।" গৃহিণী বৃদ্ধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন "বাবা! তুমি বসো, আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া গৃহমধ্যে গিয়া তাহার বসিবার জন্য একটি মাদুর ও তাহার পুত্রদের জন্য যে মিষ্টান্ন রাখিয়াছিলেন, তাহাই ও এক ঘটি জল আনিয়া উক্ত

রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে আহার করাইয়া সেই মাদুরে শয়ন করিতে বলিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ রন্ধনঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া তাহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া নিজের শয়নঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে তাহাকে উত্তম শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন। পরে নিজ পতির নিকট উক্ত বৃদ্ধের অবস্থা জানাইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী স্ত্রীর এরূপ দয়ার ও অতিথিসেবার কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পর দিবস তাহার ভালরূপ শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণীর সেবা ও যত্নে বৃদ্ধটি সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। রোগগ্রস্ত দরিদ্র বৃদ্ধকে উক্ত গৃহিণী ও কর্ত্তা, পুত্রের মত সেবা যত্ন করিতেন। একদিনও তাহার প্রতি মনে মনে ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ করেন নাই—এমন কি তাহার মল মূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সুস্থ হইলে তাহাকে কোন লোক সঙ্গে দিয়া তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্য দয়া! ইহাঁরা এরূপ দয়া প্রকাশ না করিলে হয়ত বৃদ্ধের জীবন অকালে নষ্ট হইত ও শেষে সে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইত। উক্ত বৃদ্ধেরই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ক্রমে ক্রমে ইহাঁর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রত্যেক সংসারের গৃহিণীর হৃদয়ে এইরূপ দয়া থাকা উচিত। যদি সকল স্ত্রী এবং পুরুষের মনে এইরূপ দয়া ও মমতা থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর কত নিঃসহায় জীবের মঙ্গল হয় ও কত শত জীব অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়! (ক্রমশঃ)

ত্রয়োদশ জাতীয় মহাসমিতি।

এ বৎসর মধ্যভারতের অন্তর্গত অমরাবতী নগরে "কংগ্রেস" বা জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভারতের যেরূপ দুর্ব্বৎসর, তাহাতে এবার ভারতবাসিগণ নানা স্থান হইতে যে একত্র সম্মিলিত হইতে পারিবেন, তৎপক্ষে অনেক সন্দেহ ছিল। যাহা হউক, সভাস্থলে ছয় সাত শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্থানীয় লোকেরও মহা জনতা হইয়াছিল এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী ও ইংরাজ প্রায় ২০০ মহিলা সভামণ্ডপকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা না থাকাতে তাঁহারা অবাধে পুরুষ-দিগের সহিত প্রকাশ্যে আসন গ্রহণ

করিয়াছিলেন। মণ্ডপটী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত ও সুন্দর কারুকার্য্যে বিভূষিত হইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেদীর উপর স্বর্ণ ও স্ফটিকমণ্ডিত বিচিত্র আসন বিস্তারিত এবং উর্দ্ধে চন্দ্রাতপে মহারাণীর সহিত জাতীয় সমিতির সুন্দর চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১।টার সময় সভাপতির সহিত সদস্যগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে অভ্যর্থনা কমিটার সভাপতি মহাত্মা খাপার্দ্দে এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মনোনীত সভাপতি শ্রীযুক্ত সঙ্কর নায়রের পরিচয় দিলেন। সভাপতি সভাকর্ত্তৃক বৃত হইয়া এক সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ ৩ সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৎপরে দুই দিবস সভার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। প্রস্তাব সকলের সংক্ষেপ মর্ম্ম লিখিত হইল :—

(১) কংগ্রেসের মতে ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সীমান্ত-নীতি ইংরাজরাজ্যের, বিশেষতঃ এ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কংগ্রেসের অনুরোধ, এ নীতি আর অবলম্বিত না হয়। বিলাতের স্বার্থরক্ষার্থ ইহা আবশ্যক হইলে ইহার অধিকাংশ ব্যয় ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রস্তাবক বোম্বাইয়ের বাচ্ছা, পোষক হিন্দু সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

(২) দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে ভারতের রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় এবং সীমান্ত-যুদ্ধের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থ জড়িত থাকায় পার্লামেণ্ট গত আফগান যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধেরও অধিকাংশ ব্যয় বিলাত হইতে দিবার অনুমতি করেন।

প্রস্তাবক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পোষক লাহোরের শ্রীযুক্ত যশীরাম।

(৩) বিলাতের রয়াল কমিশন ভারতবাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কয়েকটী প্রার্থনা।

প্রস্তাবক এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয়, পোষক বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, সমর্থক মান্দ্রাজের পার্থ সারথি নাইডু ও নাগপুরের কেশব রাও যশী।

সভাপতি নিজেই প্রস্তাব করেন :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রস্তাবিত আবকারী আইন, অস্ত্র আইন, সখের সৈন্য, বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা সার্ব্বিস পুনর্গঠন, জুরীপ্রথা ও ব্যবস্থাপক সভা প্রচার, কুলী আইন ইত্যাদি।

(৫) ভারতে ও বিলাতে উভয় স্থানে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রার্থনা।

(৬) দেশীয় রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে বিজ্ঞাপন আছে তাহা রহিত করা।

(৭) যে সকল প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে তাহার প্রচলন।

প্রস্তাবক বারিষ্টার জন এডাম্‌স, পোষক বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গরুড়।

(৮) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগ পৃথক্ করা।

প্রস্তাবক জে চৌধুরী, পোষক বোম্বাইয়ের শীতলবাদ।

(৯) প্রজার দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ দুর্ভিক্ষ কমিশনকে অনুরোধ করা।

শেষ দিবস পুনা বিভ্রাট ও সাময়িক আরও কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

জাতীয় সভার আগামী অধিবেশন মান্দ্রাজে হইবার সম্ভাবনা। মান্দ্রাজ কমিটি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে সাধারণকে জ্ঞাপন করিবেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস।

জীবন আহুতি দিয়ে
মহাযজ্ঞ-দেশহিতে
দেখালে যে দেবভাব
দেখিব কি অবনীতে?
হাসিতে হাসিতে সুখে
বীরেন্দ্র-কেশরী আজ
চলিলেন সুরপুরে
সাধিয়ে দেশের কাজ।
সংসার-সংগ্রাম ক্ষেত্রে
মহাবীর্য্য প্রকাশিয়া
নাশিলা কু-দেশাচার
বসুমতী কাঁপাইয়া।
শত শত অত্যাচার
লইলা মস্তক পাতি,
সহিলা তাড়না কত
অদম্য উৎসাহে মাতি।
অটল অচল সম
টলাইবে সাধ্য কার?
পায়ে ঠেলি শত বাধা
আগুয়ান অনিবার।
অবলা-বান্ধবহীন
বঙ্গের অবলাকুল
তুলিয়াছে হাহাকার
মহাশোকে শোকাকুল।
অকাতরে অন্নদান
দুখিনী বিধবা তরে
কে করিবে বল আর?
কার চক্ষে অশ্রু ঝরে?
অতুলন ক্ষমাগুণে
চিরশত্রু নতশির,
কে দেখেছ ধরাতলে
এ হেন ধরমবীর?
যে করিত নির্যাতন
তারে দিয়ে আলিঙ্গন
বাঁধিতেন স্নেহগুণে
এমনি উদার মন!
মধুর প্রকৃতি হেরি
অবাক্ মোহিত সবে,
সরল শিশুর মত
আর কি সেরূপ হবে?
হারানিধি পেয়ে আজ
হারাইলে সে রতনে,
কে আছে মা তোর মত
কাঙ্গালিনী এ ভুবনে?
কোল হতে কেড়ে নিল
অঞ্চলের নিধি কাল,
কাঁদিতে এসেছ ভবে
কাঁদ বসে চিরকাল।
যাও যাও যাও দেব
সেই দেবতার দেশে
অসার অনিত্য ভুলি
পরম যোগীর বেশে।

পশারিয়া প্রেম-বাহু
কোলে নিয়ে স্নেহময়ী
তুষিছেন কত যতে,
দিব্য চক্ষে দেখ তাই।
সযতনে সাজাইয়া
মণিময় আভরণে
বসায়ে দেবতা পাশে
দেবতার সিংহাসনে,
আশীষ করিছে কত
স্নেহময়ী স্নেহে গলি,
দেবতাসমাজে আজ
সকলেই গলাগলি।
সার্থক জনম তব
সাধিয়ে দেশের কাজ
অমর হইলে তুমি
অমর লোকেতে আজ।

শ্রীচ।

ঐতিহাসিক রহস্য।

১। দাসী রাজবংশের জননী।

ইংলণ্ডেশ্বর ১ম চার্লসের রাজত্বসময়ে একটী পল্লীগ্রামস্থ নিরুপায় দুঃখিনী বালিকা চাকরাণীর কাজের জন্য লণ্ডন সহরে আইসে। অন্য কোনও কার্য্য না পাওয়াতে বালিকা মুটিয়ার মত একটী মদের ভাঁটী হইতে মদ্য বহন কার্য্য করিতে লাগিল। ভাঁটীওয়ালা মেয়েটীর রূপ আছে দেখিয়া তাহাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করিল। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে বালিকা তাহার ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হইল। হাইড সাহেব (পরে যিনি ক্লারেণ্ডনের আরল হন) তখন ওকালতীর কার্য্য করিতেন। এই রমণীর সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। চতুর উকীল ইহাঁকে রূপবতী ও ধন-শালিনী দেখিয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফল একমাত্র কন্যা। তিনি ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্সের সহধর্ম্মিণী। ইনি ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী মেরী ও আনের গর্ভধারিণী।

২। বোনাপার্টিদিগের পত্নীগণের দুর্দ্দশা।

চার্লস বোনাপার্টি ও লেটিসিয়া রামোলিনো মহাবীর নেপোলিয়নের জনক ও জননী। ইহাঁদের ৫টী পুত্র—যোজেফ, নেপোলিয়ন, লুসিয়েন, লুই ও জেরোম। নেপোলিয়ন যখন রাজ-রাজেশ্বর, তাঁহারই প্রভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোজেফ স্পেনের অধীশ্বর হন। তিনি রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাদিগের নিতান্ত অপ্রিয় ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনে তাঁহারও পতন হইলে তিনি আপনার স্ত্রী জুলিয়া ক্লারাকে লইয়া ত্রিসংসার পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় স্থান পান নাই; অবশেষে ফ্লোরেন্স নগরে অস্থি রাখিয়া শান্তিলাভ করেন। ইহাঁর পত্নী মার্সেলের এক ধনাঢ্য বণিকের কন্যা ছিলেন। স্বামীর

মৃত্যুর পর বৃদ্ধাবস্থায় দীন দুঃখিনী বিধবা সকলের পরিত্যক্তা হইয়াও নিশ্চিন্তা হইতে পারেন নাই। তাঁহার উপর রাজদণ্ডাজ্ঞা—'যে কেহ তাঁহাকে দেখিবে, মারিয়া ফেলিবে।' তিনিও মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের দুই পত্নী—প্রথম সুপ্রসিদ্ধা পতিপরায়ণা যোজেফাইন। তিনি স্বামীর কষ্ট দুঃখ ও জীবনসংগ্রামের চিরসঙ্গিনী হইয়া যখন স্বামী সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহা কর্ত্তৃক নিরপরাধে পরিত্যক্তা হইলেন এবং মনের দুঃখে জীবন শেষ করিলেন। দ্বিতীয় পত্নী অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইসা—ঘোর গর্ব্বিতা ছিলেন। স্বামীর মহাসিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী হইয়া যেমন আকাশে উঠিলেন, তাঁহার পতনেই তেমনি নিম্নতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং অবশেষে এক সামান্য কারাগারের বন্দিনী হইয়া শেষ জীবন অতিবাহন করিলেন।

লুসিয়েন বোনাপার্টি ক্রিষ্টাইন বয়ার নাম্নী এক সামান্য ঘরের মেয়ে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র হয়। কিন্তু তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়াতে ১৮০২ সালে লুসিয়েন আলেক্‌জাণ্ড্রাইন জুবার্থন নাম্নী এক দালালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ সময় নেপোলিয়ানের ভারী দপ্‌দপা, তিনি বিপত্নীক ভ্রাতার কোনও রাজারাজড়ার ঘরে বিবাহ দিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া মহা কোপান্বিত হন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার মুখ দর্শন করেন নাই। আলেকজাণ্ড্রাইন সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী নিরীহ ধাতুর লোক থাকাতে তাঁহার উচ্চ আশা আদৌ পূর্ণ হয় নাই। ইটালীর এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ১৮৫৫ সালে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

চতুর্থ পুত্র লুই সাম্রাজ্ঞী যোজেফাইনের প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হর্টেন্স বোহারণেকে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ নেপোলিয়ান এই উদ্বাহযোগ সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; লুই তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য দুইবার বিদেশে পলায়ন করেন, কিন্তু অবশেষে ভ্রাতার আজ্ঞাধীন হন। এ বিবাহ দম্পতীর কাহারও সুখের কারণ হয় নাই। ১৮০৭ সালে লুই পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। বিপক্ষ সেনানীরা পারিস অধিকার করিয়া হতভাগিনীকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তিনি আরেনবর্গ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কলেবর পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র জেরোম ১৮০৩ সালে বাল্‌টিমোরের এলিজেবেথ পাটার্সন নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহা নেপোলিয়নের মনোনীত না হওয়াতে তৃতীয় সহোদরের ন্যায় ইনিও তাঁহার ক্রোধ খর্পরে পতিত হন। লুসিয়েনের ন্যায় জেরোমের চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না,

এজন্য মহাতেজা ভ্রাতার আদেশে তিনি অচিরে ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়ার্টেনবর্গের কাথারিণকে পত্নীত্বে বরণ করিতে বাধ্য হন। ভ্রাতাও আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ জেরোমের জন্য ওয়েষ্ট-ফেলিয়া নামক এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করেন এবং তাহার সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। যাহাহউক জেরোমের দুই পত্নীর জীবনই দুঃখের জীবন। পাটার্সন আলেকজান্দ্রাইনের ন্যায় সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন এবং নেপোলিয়নের প্রভাবে রাজমুকুট ধারণের আশাতেও আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়া তাঁহার সকল আশা চূর্ণ করিল। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ তাঁহার প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা লাভ হয় নাই। তিনি চিরদিন নিগূঢ় মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইয়া জীবন অবসান করিয়াছিলেন। তাঁহার সপত্নী কাথারিণ ১৮১৩ সালে সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি দুর্ভাগ্য স্বামীর সহিত একটু আশ্রয়-স্থান লাভের জন্য ভিখারিণীর ন্যায় অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, অবশেষে লসান নামক স্থানে মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিয়া দুঃখময় জীবনের অবসান করেন।

নেপোলিয়ন বংশের উপর কি দারুণ অভিসম্পাত! এই বংশের দুইটী রাজ্ঞী দুর্ভাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছেন :—একটি লুই নেপোলিয়ানের পত্নী সাম্রাজ্ঞী ইউজিন, দ্বিতীয়া ইটালীর রাজকুমারী ক্লটিডা। ইউজিনের সম্পূর্ণ নাম ইউজিন মেরী ডি মণ্টিজো। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে ১ম নেপোলিয়নের মৃত্যু হইলে তাহার ৫ বৎসর পরে স্পেনের রাজ-বংশে ইহাঁর জন্ম হয়। লুই নেপোলিয়ন বুদ্ধিকৌশলে যখন ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিয়া ৩য় নেপোলিয়ন নাম গ্রহণ করেন, তখন কুমারী ইউজিন মাতার সহিত পারিস দর্শনে আসেন। নেপোলিয়ন তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সাম্রাজ্ঞী ইউজিন ১৩ বৎসরকাল সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য লাভ করিয়া পৃথিবীতে মহোচ্চপদ ও পার্থিব সুখের পরাকাষ্ঠা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী জর্ম্মণ সমরে ফ্রান্সের পরাজয় হওয়াতে তাঁহার শিরে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি রাজ্যসম্পদ ও পতি হারাইয়া ফ্রান্সে মাথা রাখিবার একটু স্থান পাইলেন না, ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে গ্রেট-ব্রিটেনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অনাথ সন্তানকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে নেপোলিয়নবংশের শেষ আশার স্থল তাঁহার একমাত্র পুত্র ইংরাজ

পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়া অসভ্য আফ্রিকাবাসীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। স্বামি-পুত্র-হীনা হৃতসর্ব্বস্বা বর্ষীয়সী ইউজিনের মত দুর্ভাগিনী আজ আর কে?

রাজকুমারী ক্লটিডা ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা জেরোমের পুত্র প্রিন্স জেরোমের সহিত বিবাহিত হন। ১৮৫৯ সালে ইহাঁর বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন ইহাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের একটী মহা শুভ ফল ইটালীরাজ্যের ঐক্যবন্ধন। কিন্তু ক্লটিডা চিরদুর্ভাগিনী। শৈশবে ও বাল্যে পিতা ও স্বদেশ কর্ত্তৃক বিক্রীত ও পরিত্যক্ত, যৌবনে স্বামী দ্বারা প্রতারিত, অত্যাচরিত ও অবশেষে বর্জ্জিত হইয়া ৫০ বৎসর বয়স হইতে না হইতে অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হন। তিনি সাম্রাজ্ঞী ইউজিনের সহচরী হইয়া অনেক দিন পারিসের রাজগৃহে ছিলেন, কিন্তু সেখানে জাঁকজমক ও বাহ্য চাকচিক্যের মধ্যে তাঁহার গুণ কেহ গ্রহণ করে নাই। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও নানাপ্রকারে মর্ম্মাহত হইয়া টিউরিনের নিকট এক নিভৃত স্থানে প্রায় ৩০ বৎসর কাল কাটাইলেন। জীবনে আর যে কখনও সুখের মুখ দর্শন করিবেন, সে আশা নাই। কি আশ্চর্য্য! বোনাপার্টিবংশের সহিত যে রমণী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই, অদৃষ্টে ঘোর ক্লেশ ও দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। ইহার রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে বিশ্ব-প্রদর্শনী হইবে, রুষীয় সম্রাট তদ্দর্শনে গমন করিবেন।

২। প্রিন্স ভিক্টর দলীপ সিংহ কভেন্ট্রীর আরল্-কন্যা আনের সহিত বিবাহিত হইয়াছেন।

৩। যে মহাবীর হাবেলক সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরাজপক্ষের জয়সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সীমান্ত যুদ্ধে হত হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার পত্নীকে শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

৪। আগামী বসন্তকালে মহারাণীর ইটালীভ্রমণে যাইবার সম্ভাবনা।

৫। গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নূতন লেডী ডফারিন্ হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতাল হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা হইবে।

৬। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে শম্বুক রন্ধনের ১০০ প্রকার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার্লিনে ১৮১০ প্রকার ভিন্ন

ভিন্নপ্রণালীতে গোল আলু পাক করা হইয়া থাকে।

৭। কুচবিহারের রেলরাস্তা বিস্তারিত হইবে। এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২,০০,০০০ টাকা ঋণ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

৮। পুনাতে সড়ক পরিদর্শক র‍্যাণ্ড ও আয়ারেষ্ট সাহেবের বিধবা পত্নী-দিগের জন্য বাৎসরিক ১৮৭ ও ১৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহাদের সন্তানদের জন্যও অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৯। সার উইলিয়ম লকহার্ট বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বোম্বাইয়ের সেনাপতি সার চার্লস নেরল প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি হইবেন।

১০। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের পুত্র মানব মনের চিন্তার ফটোগ্রাফ লইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশকর্ম্মার পুত্র বিয়াল্লিসকর্ম্মা!

১১। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আয় ১,০০,০০০, কলিকাতার ৪,৮০,০০০ ও মান্দ্রাজের ২,০০,০০০ টাকা।

১২। ২৮৯৬—৯৭ সালের শিক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশে কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ৯৩, হাইস্কুলের ১৯১, মধ্যস্কুলের ১৬৮২, আপারপ্রাইমারী ২১৭০, নিম্নপ্রাইমারী ১৫৩৩২। বিদ্যালয়ে যাইবার যোগ্য বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ২জন মাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

বামারচনা।

তারা দুটি দেবকন্যা।

তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল পথ ভুলে
আলোক-আলয় হতে
আঁধারের এ মরতে,
দুই দিন এ আঁধারে মধুর জোছনা ঢেলে,
আঁধার আঁধারে রেখে কোথা গেল ফিরে চলে।

তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল খেলা ফেলে;
দুঃখময় এ হৃদয়ে
খেলার পুতুল হয়ে
হেসেছিল খেলেছিল সুখের লহর তুলে;
কেন কাঁদাইয়ে গেল দুই দিন হেসে খেলে!

সুধার সে শিশু দুটি স্নেহে ছিল সুধা মাখা;
হাসিত স্নেহের হাস,
কহিত স্নেহের ভাষ,
স্নেহের লতিকা দুটি দুলাত স্নেহের শাখা,
তারা দুটি ছিল ঘরে স্নেহ যেন পটে আঁকা।

আদরের মেয়ে দুটি আদর বিলা'ত তারা;
আদরে ধরিত গলা,
মোর আদরের দোলা
ছিল সেই মেয়ে দুটি, আদরের ডোরে বাঁধা,
খেলার সঙ্গিনী দুটি এক প্রাণ আধা আধা।

কোথা গেলি তোরা ছুটি কৌতুক-জননী
মোর ?
তোদের খেলার ছেলে
আজি সত্য আঁখিজলে
ভাসি ডাকে মা মা বলে ; তোরা কেন
নিরুত্তর ?
আজি কি নূতন খেলা নিঠুর নিঠুরতর !
বারেক ডাকিলে তোরা ব্যাকুল জননী
প্রায়
ছুটে কাছে আসিতিস্
কত কথা সুধাতিস্,
আমার তাপিত প্রাণ কত স্নেহ মমতায়
জুড়াতিস, নিয়ে এসে স্নেহের মলয় বায়।
স্নেহের পরশ লাগি এখনও এ প্রাণ ধায় ;
তোরা শুধু স্মৃতিমাঝে
নিষ্ঠুর সুন্দর সাজে
বারেক সুদূর পথে দেখা দিয়ে কেন হায় !
আঁধার আঁধারতর করিস বিজলি-প্রায় ?
কেন রে এত সুধায় সুধা এত বিষময় !
পুতুল ভাঙ্গিয়া যায়,
কুসুম শুকায় হায় !
কেন তবে ভালবাসা নারি ভুলিবারে তায় !
কেন চিরলুপ্ত ধনে হৃদয় ধরিতে চায় !
আজি ভালবাসা সুখ, কালি প্রাণ কাঁদে তায় !
বিশ্ব ভালবেসে সুখী,
ভালবেসে চির দুঃখী ;
তবু কেন ভালবাসি ? দেব ! একি মায়া হায়
শুনি তুমি ভালবাসা, তবে কেন দুখ তায় ?
দেবতার প্রাণ কিরে কাঁদে না মানবদুখে ?
এই কাল-যবনিকা,
অর্দ্ধ বিশ্ব তাহে ঢাকা;
আর অর্দ্ধ কাঁদিতেছে করাঘাত করি বুকে,
হে দেবতা ! এই দৃশ্য ব'সে কি দেখিছ সুখে ?
শ্রীব।

মহারাণী স্বর্ণময়ী !

হায় ! বঙ্গবাসী আজি হলো মাতৃহীন ;
অনাথ করি সন্তানে,
শোক দুঃখ জালি প্রাণে,
কোথা গেল আমাদের জননী রতন ;
সন্তানের প্রাণে দিয়ে দারুণ বেদন।
সহায় সম্বল হীন,
করিয়ে দরিদ্র দীন,
স্নেহের পুতুলি সবে হ'লে অন্তর্দ্ধান ;
দয়া ধর্ম্ম তেয়াগিয়া, হইয়ে পাষাণ।
কি উপায় হবে তবে,
কে ভালবাসিবে সবে,
বিতরিয়ে স্নেহ দয়া তোমার মতন,
সন্তানের দুঃখে দুঃখী জননী যেমন ?
আসিয়ে অবনীধামে,
সুযশ রাখিয়ে নামে,
তুমিত স্বরগধামে করিলে প্রয়াণ,
মোদের ভরসা আশা হইল নির্ব্বাণ।
ছিল অতুল ঐশ্বর্য্য,
পালিয়াছ ব্রহ্মচর্য্য,
দীনভাবে দিন তুমি করেছ যাপন,
কঠোর বৈধব্য ব্রত করিয়ে পালন।
লোকহিতকর ব্রত,

দয়া ধর্ম্ম অবিরত,
নিজের কর্ত্তব্য ভাবি করেছ পালন ;
করেছ সার্থক ভবে মানব জীবন।
কল্পতরু ছিলে দানে,
দেবী আর্ত্ত-পরিত্রাণে,
প্রেমমন্ত্র জপমালা ছিল জ্ঞান ধ্যান,
প্রাণপণে জগতের, সাধিলে কল্যাণ।
দানশীলা দয়াবতী,
প্রেমময়ী সাধ্বী সতী,
ভুবন ভরিয়ে তব সুযশ অশেষ,
ঘোষিতেছে কীর্ত্তি তব ইহ পর দেশ।
দেশের কল্যাণ তরে,
করি দান অকাতরে,
বিবিধ প্রকারে হিত করেছ সাধন ;
মুক্ত হস্তে স্বীয় ধন করিতে বর্ষণ।
স্কুল আর পাঠশালা,
কলেজ অতিথিশালা,
তোমার সাহায্যে সব হয়েছে নির্ম্মাণ ;
দুর্ভিক্ষেতে অন্নসত্র,
পেত দান দীন ছাত্র,
তোমার প্রেমের চক্ষে সকলে সমান ,
পাপী সাধু জ্ঞানী মূর্খে নহে ভেদজ্ঞান।
কত যে চিকিৎসালয়ে,
কত যে অনাথাশ্রয়ে;
রোগাতুর ক্ষুধাতুর পেয়েছে পরাণ ;
বাঁচিয়াছে তাহারা যে পেয়ে তব দান।
কাঙ্গাল অতিথি যত,
নিত্য নিত্য শত শত,
ভুঞ্জিত তোমার অন্ন, করুণা অশেষ ;
হৃদয় গলিত তব, দেখি দীন বেশ।

সুশিক্ষা বিস্তার তরে,
দিয়ে ধন গ্রন্থকারে,
কত উপকারী গ্রন্থ করেছ প্রকাশ ;
করিতে অজ্ঞতা নাশ, জ্ঞানের বিকাশ।
"কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি,"
সত্য যদি এ ভারতী,
তবেত জননী তুমি, রয়েছ জীবিত ;
কার্য্যত না হেরি তোমা, আছি বিষাদিত।
প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিখানি,
স্বর্ণময়ী মহারাণী,
মানস-নয়নে তোমা, হেরি'ছি সতত ;
হৃদয়ের পটে তুমি, রয়েছ অঙ্কিত।
ছিলে আদর্শ রমণী,
নারীকুল-শিরোমণি,
"ভারত-মুকুট" সত্য, ছিলে যে গো তুমি,
সার্থক তোমায় পেয়ে এ ভারতভূমি।
নিজের সুকৃতি তরে,
গিয়াছ স্বরগপুরে,
শান্তিময় বিভুকোলে, লভহে বিশ্রাম ;
ভুল না সন্তানে বলি, অকৃতি অধম।
শোক তাপ সব ভুলে,
থাকিও সদা কুশলে,
সুখেতে রাখুন তোমা, প্রভু প্রাণারাম,
নাহি সেথা দুঃখ তাপ, সে যে শান্তিধাম।
লিখিতে গুণকাহিনী,
অক্ষম যে এ লেখনী,
মূর্খ আমি তব গুণ বর্ণিব কেমনে ?
ভক্তি ফুলে চিরদিন পূজিব জীবনে।

শ্রীভুবনমোহিনী দেবী।

স্বর্গ।

১

"কোথা রহে ধ্রুবলোক
গোলোক ও ব্রহ্মলোক,
কোথায় অমরাবতী, নন্দনকানন?
'স্বরগ, এ-ত্রি-অক্ষরে
আহা! কি অমিয় ক্ষরে!
কোথা সে স্বরগ স্নিগ্ধ আলোকভূষণ?
স্বর্গ কি গগনোপরে?,,
"না না তা কেমন করে?
গগন যে শূন্য বই আর কিছু নয়,
স্বরগ সৌন্দর্য্য-সার,
গগন ত শূন্যাকার,
শূন্যে সে সৌন্দর্য্য ছটা সম্ভব কি হয়?"

২

(তবে) কোথা সেই স্বর্গস্থল?
হর্ষ বিনা অশ্রুজল
নাহি ঝরে যথা? সদা সুখের হিল্লোলে
বিলাস মলয় বায়
খরতর বেগে ধায়,
প্রফুল্ল কুসুমরাজি সুষমার কোলে,
সৌরভ মাখিয়া গায়
অনন্ত যৌবনে ভায়,
দুঃখ চির অস্তমিত সুখের প্রভায়,
বসন্ত অমর হ'য়ে
শারদী পূর্ণিমা ল'য়ে
বার মাস অবস্থান করিছে যথায়?
রোগ, শোক, বার্দ্ধক্যেরে
শাণিত ছুরিকা মেরে।
সন্তাপ-অনল যোগে করে ভস্ম ছাই;
সুখ শান্তি বারি দিয়া
সে অনল নিভাইয়া
ধুইয়া ফেলেছে ছাই চিহ্নমাত্র নাই।
হীরকের হর্ম্মারাজি
কাঞ্চন কুসুমে সাজি
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত মণির বৌটায়,
মুকুতা স্তবক ধরি
মস্তক উন্নত করি
দাঁড়ায়ে সৌন্দর্য্য ছটা বিস্তারে যথায়!
যথায় সরসীমাঝে
বৈদূর্য্যের নালে রাজে
সুনীল হিল্লোলে স্বর্ণ কমলিনীচয়,
মাণিকেতে বিরচিত,
চারি তট সুশোভিত,
সুন্দর সোপানশ্রেণী মরকতময়!

৩

"যথায় কুসুমোদ্যানে
বিহগের কল গানে
মোহিত করিয়া মন প্রাণ হরি লয়,
পবন বাহনে উঠে
দিগ্ দিগন্তরে ছুটে,
সে গীত লহরী সুধু সুধাধারাময়।
কমলা কুসুম-আলি,
পবন আপনি মালী,
বাল-বেণু-প্রভমণি-লতিকার পাশে;
সোণার মুকুলগুলি
কোমল পাপড়ী খুলি
মাণিক কেশরে সাজি হেলে দুলে হাসে!

৪

"(না,) যথা পুণ্য বিভাময়
নিত্য প্রেম চন্দ্রোদয়
প্রেমের আলোক যথা চির বিভাসিত,
শারদ কৌমুদী রাশি
সন্তোষ প্রফুল্ল হাসি,
ছুটিতেছে সে আলোকে আনন্দের গান—
"সবে মোরা ভাই ভাই,
ভাই বোন, পর নাই
শ্বেত কৃষ্ণ, রাজা প্রজা সবাই সমান,
কেন কর ভেদজ্ঞান?
হিন্দু, খ্রীষ্টী, মুসলমান
সকলে সন্তান সেই পরম পিতার।"
সে আলোকে পায় তাপ
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, পাপ;
লেখা আছে সে আলোকে "সবাই সবার",
নাহি যথা প্রবঞ্চনা,
অহঙ্কার ও [illegible],
বাসনা বিরক্তি সে আলোকে পুড়ে মরে।
মান অপমান জ্ঞান
যথায় পায় না স্থান,
যথা আত্মবলিদান জগতের তরে।
যথা অনাবৃত প্রাণ
করে প্রেম বারি দান
আপনাকে অর্ঘ্য দেয় জগতের পায়,
যথা প্রেম নদ-স্রোত,
বহিতেছে অবিরত,
চঞ্চলা আসক্তি কিন্তু ডুবে মরে তায়।
অনুরাগ অনুক্ষণ
করিতেছে সন্তরণ
প্রতি তরঙ্গের পর নাচিয়া নাচিয়া,
পরের দুঃখের তরে
যে অশ্রু নিয়ত ঝরে,
সেই অশ্রুবারি রহে এ নদে ভরিয়া।
আপনি আপনোচ্ছ্বাসে
কভু ডোবে কভু ভাসে
আপনাকে চূর্ণ করে বিশ্বের মাঝারে,
সহস্র আপনি হয়ে,
সহস্র আপনা ল'য়ে
মহানন্দে এই নদে বেড়ায় সাঁতারে।
সুন্দর সংযম-বেলা
ঢেউ ল'য়ে করে খেলা,
যথায় প্রেমের হর্ম্ম্য প্রেমের চত্বর,
প্রেমের কুসুম ফুটে
প্রেমের সৌরভ ছুটে
প্রেমের মলয়ানিল স্বনে সর্ সর্।
প্রেমের কৌমুদীরাশি
প্রেমের উজ্জ্বল হাসি
তথায় স্মরগ রহে সৌন্দর্য্যের সার,
সে সৌন্দর্য্য নাহি ধারে পৃথিবীর ধার।"

কুমুদিনী রায়।

নিদ্রা।

প্রতি নিশি শুনি আমি তোর পদধ্বনি—
অতি মৃদু দূরাগত সঙ্গীতের মত।
কোথায় অদৃশ্য হয়ে বাজাস্ না জানি—
মোহন বীণায় তোর মোহমন্ত্র যত॥

পড়ে তোর মৃদু শ্বাস আননের পরে,
আঁখি পরে জাগে তোর নীরব চুম্বন।
অয়ি নিদ্রে! মোহময়ি! কি কথা গো ধীরে
বলিস অস্ফুট স্বরে—করিয়া শ্রবণ
আঁখি দুটি মুদে আসে, ধীরে থেমে যায়
জাগ্রত এ জীবনের অধীর কল্লোল।
ঢাকি তোর শান্তিময় অঞ্চল ছায়ায়
ললাটে ও স্নেহহস্ত বুলাস কেবল।
শিয়রে ছায়াটি তোর করিয়া বিস্তার
নিয়ে যাস্ কোন্ এক মায়াময় পুরে।
অসত্য যথায় ধরে সত্যের আকার,
বাস্তব জীবন-ছায়া মিলায়রে দূরে॥

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

স্বর্ণময়ীর প্রতি।

সোণার বরণী সোণামুখখানি
নাম স্বর্ণময়ী তার,
বিনোদ মাধুরী আহা মরি মরি
কোমল সৌন্দর্য্য সার
স্বরগের শোভা মরতে গঠিত
নেহারী ও বিধুমুখে,
আঁ[illegible]ছ ওতে প্রতি পাতে পাতে
শুভ্র পবিত্রতা সুখে।
নাহিক গরিমা প্রেমের প্রতিমা
বিমল প্রশান্ত [illegible]তি,
হেরে ও সুষমা লাজেতে চন্দ্রমা
লুকায় কনকভাতি।
ছুটেছে জীবনে হীরক কাঞ্চনে
কত মরকত ফুল,
জলি স্তরে স্তরে সাহিত্য ভিতরে
হীরক তারকাকুল।
নবীনা ভারতী তুমি যে গো সতি!
আসীনা বিমল যশে,
বীণাটি ফেলিয়া এসেছ নামিয়া
না জানি কোন্ প্রয়াসে;
রমণীর মণি হও তুমি ধনী
বিধি-রত্ন-দত্ত ফুল,
হও-কি মানবী মনে মনে ভাবি,
হৃদে লেগে যায় ভুল!
অয়িগো সুভগে! তোমার গৌরবে
গৌরবিণী মোরা [illegible]
প্রকাশ সুকৃতি [illegible]ক প্রকৃতি,
[illegible] [illegible]রবে।
দেখাও যতনে নারীর জীবনে
ধরে কি না গুণ জ্ঞান,
ভূতলে আবার আর্য্যপ্রেমাধার
লভুক রমণী মান।
ভারতের ঘরে আসুকগো ফিরে
খনা গার্গী লীলাবতী,
আর্য্য-সুতগণে পূজুক যতনে
নারী সতী গুণবতী।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
সাহায়াণপুর।

No. 397. February, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৭ সংখ্যা। | মাঘ ১৩০৪—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—গত ১২ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের ৬৮ সাংবৎসরিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃসল অনেক স্থলে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে। কলিকাতাস্থ তিন সমাজেই খুব জনতা হইয়াছিল।

দেশীয় সখের সেনা—অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইসলামপুরের জমীদার বাবু প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদার বলান্টিয়র বা সখের সেনা দলভুক্ত হইয়াছেন।

সূর্য্যগ্রহণে মেলা—গত ১০ই মাঘের সূর্য্যগ্রহণে অনেক তীর্থস্থানে অনেক জনতা হইয়াছে। স্থানেশ্বরে ৬ লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। গ্রহণোপলক্ষে মাঘ মেলায় প্রয়াগে প্রায় ১১,০০,০০০ এগার লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়—১৯ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তদশ (convocation) বার্ষিক অধিবেশনে পঞ্জাবের ছোট লাট ১৬ জন এম্ এ, ১০৪ জন বি, এ এবং ২৩ জন বি, এলকে উপাধি দিয়াছেন। প্রাচ্য বিদ্যায় এক

জন মাত্র বি, এ, এবং এক জন মাত্র এম, এ, হইয়াছেন।

মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি—ইহা কলিকাতায় [illegible]। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য [illegible]য়ারের মহারাজা ৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

অশুভ লক্ষণ—১৮৯৮ সালে আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, তাহা পশ্চিম ভারতবর্ষে হইবে। আগামী এপ্রেল, মে ও জুনে এবং সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসে এক একটা ধূমকেতুর উদয় হইবে। এক বর্ষে ৫টী ধূমকেতুর উদয় অসাধারণ ঘটনা। এ দিকে সীমান্ত যুদ্ধ পুনরারব্ধ।

সংস্কৃত কলেজ সম্মিলন—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্যোগে এ বৎসরও সরস্বতী পূজার সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের একটী শুভ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

প্রাদেশিক সমিতি—এ বৎসর ঢাকা সহরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে।

দান—শিয়াড়সোলের রাণী ভবসুন্দরী দেবী একটী স্থানীয় ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—মড়ক কর্ত্তৃপক্ষদ্বয়ের হত্যাকারী দামোদর চাপকারের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। জুরীরা হত্যাকারী নয়, কিন্তু হত্যার সাহায্যকারী বলিয়া তাহাকে অপরাধী করিয়াছেন। সে হাইকোর্টে আপীল করিবে।

স্বভাবের প্রভাব।

জীবন বিকাশের উপায় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই—স্বভাবই মানব জীবন বিকাশের একমাত্র মহতী শক্তি। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতি জীবনেই কার্য্য করিতেছে। ইহারই প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে, কুসুম মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতেছে, ফল সুপক্ক হইতেছে,—প্রকৃতিতে সকল প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইতেছে, প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ইহার কার্য্য দেখিতে পাই। ঐ যে প্রান্তরে প্রকৃতির শোভন নয়নমনোরঞ্জন হরিৎ আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে;—উহা কে বিস্তৃত করিল? কে উহার শ্যামল শোভা রক্ষা করিতেছে? ঐ যে প্রসন্ন স্বচ্ছ সলিলে পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার মধুর হাস্যে ও লাবণ্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেছে—উহা কে রোপণ করিল, কে উহা বর্দ্ধিত করিতেছে—কে ঐ বিকশিত কুসুমকে হাসাইতেছে—কে

উহার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য ফুটাইতেছে? উহাদের কাহারওত নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ফুল নিজের চেষ্টায় ফুটিতেছে না। তাহার জীবন ও সৌন্দর্য্যের জন্য সে কিছুই করিতেছে না, অথচ সে জীবিত, সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য স্বভাবের প্রভাবেই সংঘটিত হইতেছে। আবার এই স্বভাবের প্রভাবেই শিশু-দেহ বর্দ্ধিত হইতেছে, বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে,—ইহার প্রভাবেই জীবদেহে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে—ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—জীবন রক্ষিত হইতেছে। সংসারের নানা কার্য্যে সর্ব্বদাই আমাদের শরীর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। স্বভাবই সতত নবদেহ, নবশক্তি প্রদান করতঃ সে ক্ষতি পূরণ করিতেছে, জীবন রক্ষা করিতেছে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রতি সাত বৎসর মধ্যে জীবদেহের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে, পূর্ব্ব দেহের একটী পরমাণুও আর বর্ত্তমান থাকে না। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা বিকশিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা অজ্ঞাতসারে এবং কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতীত কত শিক্ষাই লাভ করিতেছি! প্রকৃতি যেন বল-পূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানী, প্রেমিক ও সাধু করিতেছে। আমরা নিজ যত্ন ও চেষ্টায় যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি, স্বভাবের প্রভাবে তদপেক্ষা কত সহস্র গুণ শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহা কে বলিবে? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শিশু পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে শিক্ষা লাভ করে, সমস্ত জীবনের শিক্ষাও তাহার সমান হইতে পারে না। কিন্তু শিশুজীবন অতিক্রম করিলেই আমরা স্বভাবের প্রভাবের অতীত হইতে পারি না। পর-বর্ত্তী জীবনেও ইহার প্রভাবেই আমরা জ্ঞানে, প্রেমে ও পবিত্রতায় উন্নত হই—ইহার প্রভাবেই সর্ব্বদা প্রাণে শুভ বুদ্ধি উদিত হয় ও হৃদয়ে সদ্ভাব কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, এবং আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়। আমরা দেখিতেছি স্বভাবের প্রভাবই জীবন বিকাশের একমাত্র মূল শক্তি। এই কার্য্যে আমাদের শক্তি ও অধিকার অতি অল্পই আছে।

আমরা বীজ বপন করিতে পারি, তাহাতে জল সেচন করিতে পারি, কিন্তু উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। আমাদের এরূপ শক্তি নাই যে, কুসুম বিকশিত করিতে পারি, ফল সুপক্ক করিতে পারি। আমাদের নিজ শরীর, মন, প্রাণ বিকাশ করিবার শক্তিও আমাদের নাই। আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, শারীরিক নিয়ম পালন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাবলে আপন দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা লাভের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছামাত্র তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে পারি

না। যেমন আমরা বৃক্ষে সার প্রদান করিতে পারি, কিন্তু সে সারকে বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, দেহে পরিণত করিবার শক্তি আমাদের নাই; যেমন আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সেই আহারকে রক্ত মাংসে পরিণত করিবার সাধ্য আমাদের নাই—সমস্ত কার্য্যই স্বভাবের প্রভাবে হইয়া থাকে—উহাতে আমাদের কোনও হাত থাকে না; এ স্থলেও সেইরূপ।

স্বভাবের প্রভাব যে হৃদয়ে যে পরিমাণে মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, সেই হৃদয় সেই পরিমাণে সুন্দর, মধুর ও জীবন্ত ভাব ধারণ করে। সকলের হৃদয়েই ইহা অল্পাধিক কার্য্য করিতেছে; যে হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, সেই হৃদয়ে স্বভাব যথোপযুক্তরূপে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তাহাকে বিকশিত ও লাবণ্যযুক্ত করে। স্বভাব প্রতি জীবনকেই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। স্বভাব সর্ব্বদাই জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল। বহির্জগতে স্বভাবের শক্তি সর্ব্বদাই মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে, বহির্জগৎ এত রমণীয়, এত মধুর! অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে, তরুলতার কিরণোন্মুখীন স্বভাব হইতে তাহাদিগকে কে কবে ভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াছে? তাহারা সর্ব্বদাই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় স্থিতি করিতেছে। সর্ব্বদাই তাহাদের উপর স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব কার্য্য করিতেছে। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাহারা বাধা প্রদান করিতে পারে না, তাই তাহাদের ভিতরে স্ব স্ব ধর্ম্মের এমন মধুর ভাব বর্ত্তমান, তাই তাহারা সর্ব্বদা জীবন্ত। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আছে, স্বভাবের কার্য্যে আমরা বাধা প্রদান করিতে পারি, তাই আমাদের সকল জীবনে স্বভাবের প্রভাব মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং আমাদের জীবনও উপযুক্তরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে না। বহির্জগতে জীবন বিকাশের প্রধান শত্রু—জীবন বিনাশের প্রধান কারণ—কীটাদি। আমাদের জীবনের প্রধান শত্রু, পাপ-কীট। কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়, এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া উহাকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না, আমাদের জীবন-কুসুমেও সেইরূপ পাপ-কীট প্রবেশ করিয়া আমাদের কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত ভাব সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়, এবং আমাদিগকে আর বিকশিত হইতে দেয় না। ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে ফুলের হাত নাই, কিন্তু আমাদের জীবন-ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে আমাদের হাত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, ইচ্ছা করিয়াই যত কীটকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। যাহাকে সুন্দর মনে করিয়া আদরের সহিত হৃদয়ফুলে বাস করিতে দিয়াছি, আজ দেখি সেই বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধু—সেই সুন্দর কীট—জীবন-ফুলটী

একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কীট ফুলের জীবন নাশ করিতে আসিলে, স্বভাবই সে বিনাশ নিবারণে চেষ্টিত হয় এবং অনেক সময়েই তাহাতে সফল হইয়া ফুলের পূর্ব্ব শ্রী ফিরাইয়া দেয়। আমাদের শরীরে কোনও বিষ প্রবেশ করিলে শরীরের সমস্ত শক্তি সেই বিষ বাহির করিবার জন্য সতত কার্য্য করিতে থাকে, যাবৎ সেই বিষ বহির্গত না হয়, তাবৎ সেই শক্তি নিরস্ত হয় না। ঔষধ,—এই প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষীণ হইলে, তাহার বলের সাহায্য করে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্বভাবের প্রভাবেই ব্যাধির উপশম হয়—পূর্ব্বস্বাস্থ্য, পূর্ব্বলাবণ্য ফিরিয়া আইসে। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের কীটদষ্ট জীবন হৃত শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়, রোগমুক্ত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়া বিকাশের বাধা জন্মাইতে পারি, যে ফুল শীঘ্র ফুটিত, তাহার বিকাশের বিলম্ব ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বভাবের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিয়া জীবন বিনাশ করিতে পারি না। কীটদংশনে কুসুম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দেহ বিনষ্ট হইতে পারে—তখন স্বভাবের প্রভাব আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না—কিন্তু শত পাপ-কীট দংশনেও আমাদের জীবন একবারে বিনষ্ট হয় না। সকল সময়েই স্বভাবের অপ্রতিহত শক্তি সমস্ত কীট ধ্বংস করিয়া আমাদের জীবন-কুসুম প্রস্ফুটিত করিতে পারে। তাহার প্রভাবে নিজে অপবিত্র ও শ্রীহীন হইয়াও পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ যে মুগ্ধ হয়, ইহাই জীবনের লক্ষণ। এই শক্তিই আমাদের জীবন বিকাশের প্রধান সহায়। যদি আমাদের এই স্বাভাবিক ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ও তাহাতে মোহিত হইতে পারিতাম না। এই এক সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তির অভাবে অপরের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও সদ্ভাব আমাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারিত না। সাধুজীবনের সৌন্দর্য্য এবং সুন্দর প্রকৃতির পবিত্র দৃশ্য সকলই আমাদের নিকট বৃথা হইত। তাহাহইলে

"মলয় বাতাস বইলে পরে ফুল ফোটেরে বনে,
সাধুর বাতাস লাগ্‌লে পায় প্রেম ফুটেরে মনে।"

এ কথা কেবল কবি-কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইত। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাবেই মানবজীবন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, পবিত্রতা ও প্রেমের সংস্পর্শে পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হয়। যেমন বৃক্ষের স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সুরসাল ও সুশোভন ফল ফুলের মাধুরীতে প্রকাশিত হইয়া সকলের প্রাণ স্নিগ্ধ করে, তেমনই মানবাত্মার স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সদ্ভাব ও সদ্‌গুণ-কুসুমের মধুর লাবণ্য ও সৌরভে প্রকাশিত হইয়া জগৎ মুগ্ধ, পবিত্র ও ধন্য করে। সকলের দৃষ্টি এই প্রকার-সুন্দর জীবন্ত কুসুমের দিকে আকৃষ্ট

না হইয়া থাকিতে পারে না। কাহারও ইহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যদি মানবমণ্ডলী স্বভাবের অপ্রতিহত কার্য্যে বাধা না জন্মাইত, তাহাহইলে সমস্ত জগৎ কি সুন্দর শোভায় শোভান্বিত হইত! বহির্জগতের দিকে চাহিয়া তাহাতে স্বভাবের সুন্দর বিকাশ দেখিয়া যেমন সর্ব্বদাই মুগ্ধ হই, তেমনই মানব জগতের দিকে চাহিয়াও মুগ্ধ হইতাম। তাহাহইলে জগতে কেবল অমৃত ও শান্তির মধুর স্রোত প্রবাহিত হইত, সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিত। সংসারের দুঃখ একবারে তিরোহিত হইত বলিতেছি না, কিন্তু স্বভাবের বিকাশে স্বভাবের প্রভাবে, সে দুঃখ অমৃতের প্রস্রবণ ও শান্তির সোপান স্বরূপ হইত। স্বভাব সকলই অমৃতে পরিণত করে। স্বভাবের প্রভাবেই পঙ্কিল ও মলিন, বিষাক্ত ও লবণাক্ত সলিলকণাসমূহ রবি-তাপে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নির্ম্মল বারি-ধারায় ধরা সুশীতল করে, ধরাকে নব-জীবন প্রদান করে। স্বভাবের প্রভাবই সুখ দুঃখ, রোগ শোক, সম্পদ, বিপদ, সকল অবস্থা হইতে জীবন-উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিপুষ্ট করে। তাই বলিতেছি স্বভাবের কি সুমহান্ প্রভাব! ইহা দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করে, গরল হইতে অমৃত উৎপন্ন করে, অশান্তি হইতে শান্তি উৎপন্ন করে। এই স্বভাবই জীব ও প্রকৃতির ধর্ম্ম, ইহাই জগৎকৃপা, ইহাই জগৎশক্তি। পরমেশ্বরের করুণা ও শক্তি আমাদিগকে পাপ ও অপবিত্রতা হইতে পুণ্য ও পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আকর্ষণ করিতেছে। নিতান্ত অসাড় ও মৃত না হইলে পরমাত্মার এই টান, এই আকর্ষণ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা অসাড় ও মৃত হইয়া থাকিতে চাহিলেও, জীবনবৃক্ষের মূলে রসপ্রবেশের পথে বাধা জন্মাইলেও, পাপ পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নিতান্ত কুৎসিত হইয়া থাকিলেও করুণাময় ঈশ্বরের সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও অসীম স্নেহে সকল অবস্থা ধরা পড়িতেছে, আমাদের মৃত্যুপথ রুদ্ধ হইতেছে, জীবনবৃক্ষের মূলে আবার রস প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার অবিরাম কার্য্যশীলতা ও স্নেহগুণে মৃত, অসুন্দর ও কুৎসিত হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সকলকেই জীবিত হইতে হইবে; সুন্দর হইতে হইবে, উঠিতে হইবে, চলিতে হইবে। তিনিই সমস্ত করিবেন। তাঁহার অসীম শক্তি, মহতী ইচ্ছা সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

পরমাত্মাই আমাদিগকে পবিত্রতা হইতে অধিকতর পবিত্রতাতে, জ্যোতি হইতে উজ্জ্বলতর জ্যোতিতে, উন্নত হইতে উন্নততর লোকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণের বিরাম নাই, ইহা অনন্ত কালের জন্য। এই আকর্ষণের জন্যই আমাদের অনন্তজীবন—অনন্ত উন্নতি—অবিরাম গতি। স্বভাবের প্রভাবেই আমরা উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতেছি, এক অবস্থায় এক স্থানে স্থির

থাকিতে পারিতেছি না, এইজন্যই অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি। এই অনন্ত গতি, ও অনন্ত উন্নতির প্রবাহ কেবল আমাদের মধ্যেই রুদ্ধ নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই প্রভাবে অনন্ত গতিশীল, অনন্ত উন্নতি-পথে প্রধাবিত, কিছুই এক অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিতেছে না। আমরাও এই অনন্ত উন্নতির স্রোতে, এই স্বভাবের সুমহান্ প্রবাহে জীবন ঢালিয়া ধন্য হই। আমরাও অনন্ত দেবের মহান্ ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিয়া, সতত বিকাশোন্মুখ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্ত গতিতে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হই। মানব জীবনে স্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক—সব জীবন্ত, মধুময় ও সুধাময় হউক।

কলালাপ।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হস্তলাঘব,—অলক্ষিত ভাবে নিজ বা পর হস্তের সঞ্চালন দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর প্রবর্ত্তন। এ দেশে "হস্তচালন", "করলিপি" প্রভৃতি ব্যাপার বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। মৈস্মরতত্ত্ব অর্থাৎ মেস্‌মেরিজম্ তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। একজনের অক্ষি-সমীপে নানা ভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাকে অচেতন করা হয়। ইহা এক প্রকার মৈস্মরক্রিয়া। এই ক্রিয়ার অন্যবিধ প্রকরণও আছে। যাহাহউক, হস্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি, এই কলার অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। কোন ব্যক্তির দেহে কোনরূপ বিষজ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইলে, তাহা কোন্ জাতীয় কীট, পতঙ্গ, বা গোধিকার বিষ; তাহা হস্তসঞ্চালন (হাতচালা) দ্বারা নির্ণয় করা হয়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে, সেই সর্প নাগ, কি বাসুকী জাতীয়, ঐ হাতচালায় তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সকল সর্প বিষধর, তাহা বাসুকী-জাতীয় এবং যাহারা বিষধর নহে, তাহারা নাগজাতীয় সর্প। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, বা হারাইয়া গেলে, হাতচালার দ্বারা তাহারও সন্ধান হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন বাম হস্ত মৃত্তিকার উপর স্থাপন করেন। করতল কিয়ৎ কাল ভূমিস্পৃষ্ট হইয়া নিশ্চল থাকে। হস্ত-চালক অনুচ্চস্বরে নিরন্তর মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। সে সকল মন্ত্র প্রায় কাহাকেও সহজে শিক্ষা দেন না। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, সে সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে শিক্ষিতগণের রুচি ও বিশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, ঐ নিশ্চল হস্ত ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করে। যে স্থানের যে ভূমিতে এই হস্তচালনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

হয়, সেই ভূমির একদেশে পূর্ব্বেই একটী মনুষ্য অবয়ব অঙ্কিত হইয়া থাকে। চালিত হস্ত সেই অঙ্কিত অবয়বের অঙ্গ-বিশেষ স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘন করে। সেই চিত্র স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘনের প্রকারাদি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই করচালনে অনেকেরই বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ বলেন, এই হস্তচালন চালকের ইচ্ছাকৃত প্রতারণামাত্র। অশিক্ষিত প্রতারকগণ ইহা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মন্ত্রে বিশ্বাস না হইলে নিজের হস্তসঞ্চালন বিষয়ে অপরের এরূপ মন্তব্য প্রকাশ অসঙ্গত নহে।

করলিপি বিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনা, বোধ হয়, অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় করলিপি দ্বারা অনেক লৌকিক ও অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছিল, তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহা অনেক দিনের কথা, ইহার সত্যতার জনশ্রুতি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই; সুতরাং ইহাতেও অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। করলিপি ক্রিয়ার সহিত বোধ হয়, প্রেততত্ত্ব বা যোগ বিশেষের সম্বন্ধ আছে; নতুবা তাদৃশী অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্ভবে না। এই প্রক্রিয়াবিৎ ব্যক্তিগণ একটী নিরক্ষর কুমার, বা কুমারীর কর পরিচালিত করিয়া তদ্দ্বারা অদ্ভুত প্রশ্নাবলীর উত্তর লিপিবদ্ধ করাইয়া থাকেন। কখন বা নিরক্ষর যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অচেতন করিয়া তাহার কর দ্বারা উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

১২৭৮ সালে রাণাঘাটের সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীগোপাল পালচৌধুরী বাতব্যাধি রোগে শয্যাগত হয়েন। ঐ পীড়ায় তিনি প্রায় নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া পরিশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে নিরাময় করিবার উদ্দেশে বিবিধ লৌকিক ও দৈবানুষ্ঠান করা হইয়াছিল। করলিপি দ্বারা পীড়া বিষয়ক শুভাশুভ তত্ত্ব নির্ণয় করণ তন্মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বীরনগরনিবাসী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন ব্রাহ্মণ ঐ অনুষ্ঠানের নেতা ছিলেন। একাদিক্রমে এক সপ্তাহ কাল ঐ অলৌকিক অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। প্রায় বিংশতিটি ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন। আমরাও সাত দিন ধরিয়া তাহা দেখিয়া তাহার দৈনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

একটী বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণযুবককে আসনে বসান হইল। এই যুবাটী নিতান্ত নিরক্ষর ছিল। তাহাকে গঙ্গাজলে আচমন করিতে বলায় সে তাহা করিল। তাহার সম্মুখে গঙ্গামৃত্তিকা চূর্ণের একটী ক্ষুদ্র স্তূপ রক্ষিত হইল। ব্রাহ্মণ-যুবক অনুষ্ঠাতার আদেশে

ঐ মৃত্তিকা স্তূপের উপর দক্ষিণ করতল স্থাপন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল। অনুষ্ঠাতা পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যুবকের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং নিজ মুখে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যোগাসনে উপবিষ্ট যুবকের মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গিতে লাগিল এবং দন্তঘর্ষণের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অনুষ্ঠাতা এক একবার যুবকের চক্ষুদ্বয়ে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুবকের দক্ষিণ কর সঞ্চালিত হইয়া মৃত্তিকা-স্তূপকে ভগ্ন করিল এবং চূর্ণ মৃত্তিকাকে সমধরাতলে বিস্তৃত করিল। অনন্তর বিস্তৃত করতল তদুপরি ঘুরাইতে লাগিল। "মা লেখ! মা লেখ!" কর্ম্মী নিরন্তর এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যুবকের তর্জ্জনী ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, কেবল তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মৃত্তিকাসংযুক্ত রহিল। এই সময়ে রোগীর পক্ষ হইতে বিবিধ প্রশ্ন হইতে লাগিল। প্রশ্নানুক্রমে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ধূলি-ক্ষেত্রে উত্তর সকল লিখিত হইতে লাগিল। সাত দিন প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া বিবিধ উৎকট প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছিল। শেষে দেখা গেল, সেই বর্ণজ্ঞানবিহীন যুবক অচেতন অবস্থায় রোগের উৎপত্তি, স্থিতি-কাল, প্রতীকার জন্য স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম, বলি, ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল উত্তর লিখিয়াছিল, সকলই শাস্ত্র ও যুক্তি-সঙ্গত। তবে এইটুকু বুঝা গেল কর্ম্মীর জ্ঞানের সীমা যতদূর, যুবকের কোন উত্তরই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহাতে বোধ হয় কর্ম্মী যেন যুবকের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন, তাহাও নহে। তিনি সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, অথচ এই অদ্ভুত কাণ্ড অনায়াসে প্রদর্শন করিলেন। কাহারও মনে এমন সংশয় হইতে পারে যে, ঐ যুবক নিরক্ষর হইলেও, তাহাকে পূর্ব্বে সাধারণ প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখিতে শিখান হইত। এরূপ সংশয় করিবার স্থল আদৌ নাই। কেননা, প্রতিদিন যখন এই অনুষ্ঠান শেষ হইত, তখন ঐ যুবক সম্পূর্ণ অচেতন। তাহার চৈতন্য সম্পাদনার্থ ত্রিশ ত্রিশ কলস জল মস্তকে ঢালিতে হইত এবং দন্ত ও হস্ত পদের সন্ধি শিথিল করিতে ২।৩ জন বলবান্ পুরুষকে বল প্রয়োগ করিতে হইত। তাহার তৎকালীন অবস্থা দর্শনে হয়ত আর চৈতন্য হইবে না বলিয়া আমরা সশঙ্কিত হইতাম। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায়, এই বিস্ময়োৎপাদিনী বিদ্যা এককালে এ দেশে এত সহজবোধ্য হইয়াছিল যে, যে সে তাহা শিক্ষা করিতে পারিত। এমন

বিদ্যার এককালে লোপ হওয়া নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

কৌচুমার যোগ,—আপনাতে নানা রূপের অভিব্যক্তি। আমরা ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি যে, দ্রব্যগুণে মনুষ্য আপনাকে নানা রূপে প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু মহর্ষি কুচুমারের আবিষ্কৃত যোগ সেরূপ নহে। বোধ হয় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত এই কৌচুমার যোগ প্রভাবে মনুষ্য আপনাকে অণুবৎ ক্ষুদ্র দেখাইতে পারেন। আপনি এমন লঘুভার হইতে পারেন এবং অন্য পদার্থকে এমন লঘুভার করিতে পারেন যে, তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এমন জনশ্রুতি আছে যে, কোন কোন সাধু সকলের সমক্ষে দিবালোকে জলের উপর পদব্রজে নদীপার হইয়াছেন। কেহ বা আপনার কাষ্ঠপাদুকা লতাতন্তুতে লম্বমান করিয়াছেন। রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কেশ্বর-পুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। মহাভারতপাঠে জানা যায়, দেবগণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরাজকে গগন-মার্গে পরিচালিত করিয়াছেন। এরূপ ঘটনার কথা কতই শুনা যায় এবং পুরাতন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। এ সকল ব্যাপার কি? বোধ হয়, কৌচুমার যোগ সিদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

১। পানকরস-রাগাসব যোজন,—পানক অর্থে শরবৎ। রস,—রাগ,—আসব অর্থে যথাক্রমে মধুর অম্লাদি রস, লোহিত পীতাদি বর্ণ এবং সুরাদি মাদক। জলমিশ্রিত সীতাশর্করাদির নাম শরবৎ,—অর্থাৎ মিশ্রি বা চিনির পানা (পানক)। ঐ পানায় বিবিধ আস্বাদ যোগ, নানাবিধ রঙ্গ করণ এবং সুরাদির মিশ্রণ পূর্ব্বক পানকের মাদকতা গুণ উৎপাদন। এখন চা, কাফি খাইয়া যে কার্য্য হয়, পূর্ব্বকালে উপরি-উক্ত প্রকার শরবৎ পান করিয়া বোধ হয় সেই কার্য্য হইত। এখন দেখা যাইতেছে, চা পান করা সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক ইংলণ্ডেই বৎসরে চৌদ্দ কোটি টাকার চা খরচ হইয়া থাকে। তদনুসারে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে কত টাকার চা খরচ হয়, তাহা অনুমান করাও কঠিন। ইংরাজের অনুকরণে, বোধ হয় বাঙ্গালীরও শতকরা পঁচিশ জন চা-খোর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যিনি সকালে বিকালে চা পান না করেন, তাঁহাকে অসভ্য বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক, এ হিসাবে ভারতবাসী বহু পূর্ব্বকালে সভ্য হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। কেননা যখন পৃথিবীতে চা ও কাফির গুণ প্রকাশ পায় নাই, তখনও তাঁহারা শরবতে চা ও কাফির গুণ যোজনা করিতে শিখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য একটী বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কোনরূপ মাদক সেবনে হঠাৎ দৈহিক ক্লম অপগত হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে।

এই জন্যই শ্রমশীল মানবসমাজে মাদকের এত প্রাদুর্ভাব। কিন্তু উহার পরিণাম ফল বিষময়। কোনরূপ মাদক কিছু দিন সেবন করিলে, তাহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ উহার মত্ততাজনিকা শক্তি দেহে থাকে, ততক্ষণই শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি ও লঘুতা থাকে,—কিন্তু তাহার পর অর্থাৎ নেসা ছুটিয়া গেলে দেহ ও মনে দ্বিগুণ অবসাদ উপস্থিত হয়। এই অবসাদ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু চা, কাফি, অথবা এই কলায় বিবৃত পানকে অল্পপরিমাণে মাদকতা শক্তি থাকিলেও, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। চা ও কাফিতে ঐ শক্তি স্বভাবতঃই আছে এবং প্রাচীন পানকে যে মাদক মিশ্রিত করা হইত, তাহা সাধারণ গৌড়ী বা পৈষ্টী, উৎকট সুরা নহে;—তাহা আসব, অর্থাৎ পুষ্পমধু। এই জন্যই জনসমাজে চা ও কাফির এত আদর এবং প্রাচীন কালেও আসবমিশ্রিত পানকের তাদৃশ গৌরব ছিল।

(ক্রমশঃ)

আত্মঘাতিনী।*

১

কে জানে কেমন ক'রে
সে নিঠুর গেল ম'রে,
সুখদা বসুধা-পানে
দেখিল না চেয়ে,
আমাদের শশী রবি,
তারো ছিল ওরা সবি,
তারেও শুনা'তে, পাখী
বেড়াইত গেয়ে।

২

তারেও ঢালিতে প্রীতি,
কুসুম হাসিত নিতি,
তারেও মলয়ানিল,
দিত জুড়াইয়া,
আমাদের সাথী যারা
তারো ছিল সবি তা'রা,
প্রকৃতি স্নেহের কোল
দিত পসারিয়া।

৩

যদিও তাহার বুক
ভরা ছিল কত দুখ,
মরমে জ্বলিত সদা
লুকানো অনল,
তবুতো মা-বসুন্ধরা,
অনন্ত শোভায় ভরা,
তবুতো মানব-গেহ
শত প্রীতিস্থল!

*সাহিত্য-সেবিকা, বামাদের কোনও বিধবা বঙ্গ রমণীর শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

৪

কত প্রাণ তার লাগি,
আনন্দে উঠিত জাগি,
কত আঁখি তার দুখে
ঝরিত নির্জ্জনে,
কত স্নেহ কত প্রীতি,
কতজনে দেছে নিতি,
কত সাধ কত আশা
ছিল আরো মনে!——

৫

সকলি ভুলিয়া হায়,
জীবনে দলিয়া পায়,
অনা'সে সে চলে গেল,
উদাসীর প্রায়,
গভীর আঁধার রেতে
নীরব শয়ন পেতে,
ভাঙিল সাধের খেলা,
মরণ-ছায়ায়!

৬

কে জানে তখন তার
দু'টি তপ্ত অশ্রুধার,
উজল কপোলযুগে
বহেছিল কি না,
কে জানে প্রাণের টানে
চাহিয়া জগত-পানে,
ভাবিল কি "বাঁচি যদি,
মৃত্যু চাহিব না!"

৭

চির প্রিয় মুখগুলি
অলস নয়ন তুলি,
যবে সে মুমূর্ষু-প্রাণে
আসিল ভাসিয়া,
তখন অবশ করে
ধীরে ধীরে—সকাতরে,
শেষ আঁখিজল বুঝি
ফেলিল মুছিয়া!

৮

আবার রুচিরা উষা
পরিয়া কনক ভূষা,
ভাঙিল বিশ্বের ঘুম
অমিয় বাতাসে,
তারে ও সাধিল কত—
সে কুমুদ জন্ম মত,
ঢেকেছে যে মুখ, চির
অন্ধকার বাসে!

* * * *

৯

আজো তার বাতায়নে,
হাসে শশী তারা সনে;
পাপিয়া "প্রভাতী" গেয়ে,
জাগাইতে যায়,
না পেয়ে স্নেহের সাড়া
ভয়ে ফিরে আসে তা'রা,
শূন্য ঘরে বায়ু শুধু
করে "হায়! হায়!"

১০

আর সে নিতান্ত নাই!
মিছা কাঁদে বন্ধু ভাই,
আর সে অভিমানিনী
দেখিবে না চেয়ে!
গেছে যদি সুখে যাক্‌,
কুশলে—আরামে থাক্‌,
জুড়াক্‌ তপত হিয়া
মা'র কোল পেয়ে!

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)

গোরুর প্রসব সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে। একগাছা শক্ত দড়ী অগ্রে যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ দড়ী বৎসের আগপায়ে বাঁধ ও গাভী যেমন প্রসবের নিমিত্ত কোঁথ দিতে থাকিবে, অমনি একটু একটু করিয়া টান। দড়ী না বাঁধিয়া কেহ কেহ হাতে ঘুঁটের ছাই মাখিয়া বৎস ধরিয়া অল্পে অল্পে টানিয়া থাকে। এই সময়ে সাবধানে থাকিবে যেন পড়িয়া গিয়া বৎসের মস্তকে আঘাত না লাগে।

প্রসব হইবার সময় যদি বৎস অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

যদি বৎসের লাঙ্গুল অগ্রে বাহির হয়, তাহা হইলে বাছুরকে ফিরাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এ অবস্থায় বাছুরকে টানিয়া বাহির করা সুবিধাজনক। এই কাজে একটু তৎপর হওয়া আবশ্যক, তা না হইলে বাছুর হাঁপাইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। হস্তদ্বারা বাছুরের কটিদেশ একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পশ্চাদ্‌ভাগের একটী পায়ের জঙ্ঘা ধরিয়া টান, তাহা হইলে একটী পা নির্গত হইবে। পরে আর একটী পা নির্গত কর।

যদি আগে সামনের পা নির্গত হয়, কিন্তু মস্তক ভিতরে থাকে, তাহা হইলে বাছুরের মুখ হাত দিয়া পায়ের মধ্যে সরাইয়া দাও এবং গাভী যেমন কোঁথ দিতে থাকিবে, বাছুরকে অমনি একটু একটু করিয়া টানিয়া বাহির কর।

যদি বাছুরের উদরের পার্শ্বভাগ উপরে থাকে, মস্তক ও স্কন্ধ এক পার্শ্বে থাকে, এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে বৎসকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পায়ের সঙ্গে মস্তকের সহিত নির্গত করিতে চেষ্টা কর।

সামনের পা যদি মাথার সহিত বক্ষঃস্থলের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে বাছুরকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিলে মস্তক দেখিতে পাইবে, কিম্বা পা দুইটী বক্র হইয়া উদরের নীচে আছে দেখিতে পাইবে। এক একটী সামনের পা ক্রমে ক্রমে বাহির কর। যদি মরিয়া গিয়া বাছুরের মস্তক অত্যন্ত ফুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে একখানি সূক্ষ্মধারবিশিষ্ট অস্ত্র কৌশলপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা বাছুরের ঘাড়ের কাছ হইতে নাক পর্য্যন্ত কাটিয়া বাহির কর, এবং সামনের হাঁটু ধরিয়া মৃত বৎসকে ক্রমে ক্রমে বাহির কর।

যদি বাছুরের একটা পিছনের পা অগ্রে নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা ভিতরে ঠেলিয়া দাও, কারণ পিছনের ও সামনের পা একত্র ধরিয়া বৎসকে নির্গত করা যাইতে পারে না।

এই সকল উপায় দ্বারা যদি বাছুরকে নির্গত করা দুঃসাধ্য হয়, তবে গাভীকে কপিকলে ঝুলাইয়া সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত কর, পরে প্রসবদ্বারে হাত প্রবেশ করাইয়া বাছুরকে জরায়ুর ভিতর ঠেলিয়া দাও এবং ফিরাও, পরে তাহার মস্তক ও সামনের পা ধরিয়া অনায়াসেই বাহির করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

(৩২৮ সংখ্যা—৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

এই গৃহিণী ও কর্ত্তা সামান্য অবস্থার মনুষ্য হইলেও ইহাঁদের মনের প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত উন্নত ছিল এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিক আস্থা ছিল। নিজের সংসারের শত কষ্ট সহ্য করিয়াও ইহাঁরা পরের উপকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। গৃহিণী প্রত্যহ একটী দরিদ্রা বৃদ্ধাকে বাড়ীতে খাইতে দিতেন। এক দিন সে ভিক্ষা করিতে আসিয়া আপন নিঃসহায়তার ও দুর্দ্দশার কথা ঐ গৃহিণীকে জানায়। তিনি তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এবং আপনাদের সংসারের অল্প আয় ভুলিয়া গিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে প্রত্যহ আসিয়া আহার করিতে বলিলেন। কত দিন তাহাকে নিজের মুখের গ্রাস দিয়া সানন্দচিত্তে সামান্য কিছু আহার করিয়া থাকিয়াছেন। এই কর্ত্তা ও গৃহিণীর এমন দয়ার শরীর ছিল যে, ইহাঁদের মুখ দেখিলেই তাহা লোকে বুঝিতে পারিত এবং আপন আপন কষ্টের কথা জানাইত। এই গ্রামে কত ধনী লোক বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে দরিদ্র লোকদের ভাগ্যে একমুষ্টি ভিক্ষা সকল দিন জুটিত না। অথচ এই সামান্য অবস্থার লোকের বাড়ীতে যে কোন রকমের অসহায় লোক আসুক না কেন, কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। ইহাঁরা পরের দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইতেন ও প্রাণপণে তাহার উপকারের চেষ্টা করিতেন। পরের ক্লেশের কথা শুনিলে যতক্ষণ তাহার কষ্টের লাঘব করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। হৃদয়ের এই উদারতাগুণের জন্যই ঈশ্বর তাঁহাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। এই গৃহিণীর মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং দয়া দেখিয়া সকলে শত মুখে প্রশংসা করিত। বাড়ীর গৃহিণী যেরূপ সদ্গুণ-

শালিনী ছিলেন, কর্ত্তাও সেইরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদের অবস্থা অতি সামান্য হইলেও আচার ও রীতি নীতি বড় উন্নত ছিল। ইহাঁদের মনের মহত্ত্ব-গুণে ধনী ব্যক্তি সকল ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও সমাজের সকল কর্ম্মেই উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণীকে অগ্রগণ্য করিতেন। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণী যে কর্ম্মে থাকিবেন, সে কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে; কেননা ইহাঁরা বড় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। গৃহিণীর গুণপণা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, যে তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিত, সেই বুঝিতে পারিত। তাঁহার বাড়ী ঘর, রন্ধনশালা, ও প্রাঙ্গণ এমন পরিষ্কার থাকিত যে, সকলে দেখিয়া পুলকিত হইত। গৃহিণী সাংসারিক পাট ঝাঁট রন্ধন প্রভৃতি কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া আপনি বা পুত্র কন্যাগণ যে অপরিষ্কার থাকিতেন, তাহা নহে। যেমন আপনি তেমনি পুত্র কন্যাগণ সর্ব্বদা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন যে, দেখিলেই বোধ হইত যেন বাড়ীতে সতত লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। পুত্র কন্যাদের শয্যা প্রত্যহ স্বহস্তে কাচিতেন, পাছে অপরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে সন্তানদের পীড়া হয়। আয় অল্প বলিয়া যা, তা, খারাপ সামগ্রী সন্তান-দিগকে খাইতে দিতেন না। স্বহস্তে মুড়ি ভাজিয়া তাহাই সন্তানদের জলযোগ করিতে দিতেন। বাড়ীতে একটী পয়স্বিনী গাভী রাখিয়াছিলেন। এই গাভীর দুগ্ধ খাইয়া আমার সন্তানগণ জীবন ধারণ করিতেছে বলিয়া স্বহস্তে পরম যত্নে গাভীটীর পরিচর্য্যা করিতেন। স্বামীর আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া তিনি পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পাছে পীড়া হইলে স্বামীকে জ্বালাতন হইতে হয় বা বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়, এজন্য সতত সাবধান হইতেন। সামান্য অসুখে পারতপক্ষে চিকিৎসক ডাকিতেন না। দেশী গাছগাছড়ার ঔষধ এত জানিতেন যে, সামান্য পীড়ার আপনি চিকিৎসা করিতেন। ব্রাহ্মণও অনেক গুলি সন্তানের পিতা অথচ আয় অল্প বলিয়া বিপুল পরিশ্রমে ও চেষ্টায় বেশ ভাল রকম চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। এমন কি অনেক বড় বড় চিকিৎসক ইহাঁর নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতেন। এজন্যও ডাক্তারকে প্রায় অর্থ দিতে হইত না। নিজে না খাইয়া সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে একটী কপর্দ্দক ব্যয় করিতে বড় কাতর হইতেন। পরার্থে স্বার্থ পরিত্যাগই গৃহীর মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রের সাধনা করিতে তাঁহারা ক্ষণকালও ভুলিতেন না। মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া যদি পাঁচজনের উপকার না করিলাম, দীন দুঃখীকে আশ্রয় না দিলাম, অন্ধ আতুরকে একমুষ্টি ভিক্ষা না দিলাম, তবে জীবনই বৃথা ও উপার্জ্জিত অর্থও বৃথা, ইহাঁদের উভয়ের এই ধারণা ছিল। এই মহৎ গুণেই ক্রমে ইহাঁরা সর্ব্বাংশে মহৎ হইয়াছেন এবং গৃহিণীর অপরিসীম

গুণেই ইঁহাদের সংসার আদর্শ সংসার হইয়াছে। গৃহিণী যদি পিতার ধনে গর্ব্বিত হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ হইত না। সংসারে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সন্তানদের উপর কখনও অমনোযোগী হন নাই। সতত তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। যে সকল কুসংসর্গে থাকিলে সন্তানদের পরিণাম অতি শোচনীয় হইবে, এরূপ সংসর্গে কদাচ থাকিতে দিতেন না। পরে যাহাতে পুত্রেরা মানুষ হয় ও কন্যাগণ প্রকৃত গৃহিণী-পদের যোগ্য হয়, এজন্য সতত কায়মনে ভগবানকে ডাকিতেন ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতেন। ইঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য প্রত্যহ দুইবেলা পিতা সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ইঁহারা জানিতেন যে, বেতনভোগী শিক্ষক যেরূপ শিক্ষা দিবেন, ও তাহাতে সন্তানগণ যে শিক্ষা লাভ করিবে, তদপেক্ষা পিতার নিকট অধিক শিক্ষা হইবে। পিতামাতার শিক্ষায় যে ফল হয়, শিক্ষকের শিক্ষায় তাহা কখনই হয় না। এজন্য বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও ইনি পুত্রদিগকে নিজে শিক্ষা দিতেন এবং ফলও তদ্রূপ পাইয়াছেন। শিক্ষকের নিকট যাহা ছয় মাসে শিখিত, পিতার নিকট তাহারা তাহা ছয় দিনে শিখিতে লাগিল। সন্তানগণ ক্রমে বড় হওয়াতে ও শিক্ষালাভ করাতে সংসারের ব্যয় বাড়িতে লাগিল। আর পূর্ব্বের আয়ে চলা কষ্টকর হইতে লাগিল। এজন্য কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভাবনা বাড়িতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সংসারের একটু সচ্ছলতা হয় ও সন্তানদের শিক্ষা উত্তমরূপ হয়, এই ভাবনা তাঁহাদিগকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কর্ত্তার যে বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিল, ক্রমে সেটী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বিবাহের সময় হইল। বৈমাত্রেয় ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মণ কখনও তাহাকে অনাদর করেন নাই, নিজের কন্যার মত তাহাকে ভালবাসিতেন, গৃহিণীও সেই মাতৃহীনা ননদকে কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করিয়া অতি যত্নে লালনপালন করিতেন এবং সে যাহাতে পরিণামে কষ্ট না পায়, এই জন্য একটী সুপাত্র সন্ধান করিয়া তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটী সুপাত্র পাইলেন। কিন্তু সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে গেলে কিছু বেশী অর্থের প্রয়োজন, এজন্য ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন কি করিব? প্রাণ থাকিতে এই মাতৃহীনাকে কোনও অপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিব না। আমরা সুখে থাকিব, আর আমার ভগিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, অথচ আমাদের কৌলীন্যপ্রথায় ভাল পাত্রে কন্যা দিতে গেলে অনেক

অর্থের প্রয়োজন, অতএব সে অর্থ আমি কোথায় পাই? আমার কেবল ভগবান্‌ই সম্বল। তখন স্ত্রী বলিলেন তুমি কেন ভাবিতেছ? আমরা যাঁহাকে সম্বল করিয়াছি, সেই চিরসম্বল ভগবান্ আমাদিগকে দয়া করিবেন। দেখ আমার পিতৃদত্ত যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা বিক্রয় কর এবং সেই অর্থে উক্ত পাত্রে তোমার ভগিনীর বিবাহ দাও। আমার অলঙ্কার থাকিতে তুমি কাহার নিকট ঋণ করিতে যাইবে? স্ত্রীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া স্বামী আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। যদিও স্ত্রী অলঙ্কার বিক্রয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল, তথাপি তিনি ভগিনীর জন্য সানন্দচিত্তে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং বিক্রয় করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা পাইলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইহাঁর বিমাতার কিছু স্ত্রীধন ছিল। কিন্তু পাছে উহাঁর সপত্নী-পুত্র এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এই সন্দেহে সেই সম্পত্তির একখানি উইল করিয়া যাহাতে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উহা পায়, এজন্য তাহা মৃত্যুকালে কোনও আত্মীয় জনের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাহার নিকট তাহা রাখিয়াছিলেন, সে বলিল যে উহারই সম্পত্তি, অতএব উহারই বিবাহের জন্য তুমি এই সম্পত্তি হইতে কিছু লও, তাহা হইলে আর তোমাকে স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিতে হইবে না। কিন্তু ইহাঁরা এমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না। বলিলেন যখন বিমাতা আমার উপর বিশ্বাস করিয়া এই সম্পত্তি আমার হস্তে দিয়া যাইতে পারেন নাই, তখন আমি উহা লইতে পারি না। শেষে ভগিনী এই সম্পত্তি ভোগ করিলেই আমি চিরসুখী হইব। আমার ভগবান্ আছেন। এই বলিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সমারোহে ভগিনীর বিবাহ দিলেন। বহুল অর্থ ব্যয় হইল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তাঁহার দরিদ্রা-বস্থায় তিনি যে আপন বৈমাত্রেয় ভগিনীর উত্তম পাত্রে বিবাহ দিতে পারিয়াছেন, ইহা জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ দিলেন ও পরম সুখী হইয়া ভগিনীকে স্বামি-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিমাতা।

১

আমি হিন্দু পরিবারের মেয়ে হইলেও আমার বিবাহ হইতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাবা অপিসে চাকরি করিতে করিতে হঠাৎ মারা গেলেন; ভাই দুটী আমার চেয়ে বয়সে ছোট; অন্য উপযুক্ত

অভিভাবকও নাই; সেই জন্য মা'র একান্ত ইচ্ছা সত্বেও আমার বিবাহ শীঘ্র ঘটিল না। আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে দুইবেলা ঘটকী যাতায়াত করিতে লাগিল।

আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া ও সেলাইয়ের কাজ করি। বাবার একটী ছোট হারমোনিয়ম যন্ত্র ছিল, সেটীও বাজাইতে পারি। ইহা ভিন্ন কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মও করিতে হয়; অবকাশসময়ে তিন ভাই বোনে মিলিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করি; মা আমাদিগকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এই সকল আমোদে বিবাহের প্রতি আমার মনের ঝোঁক নাই,সে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু চিন্তাও করি না।

যাহা হউক সহসা আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। একজন বড় ডাক্তার; বয়স উনত্রিশ বৎসর; সম্প্রতি দুইটী শিশু পুত্র রাখিয়া, তাঁহার পত্নী পরলোকে গমন করিয়াছেন; ঘরে তাঁহার এক বিধবা পিসিমা আছেন, অন্য কেহই নাই; সেইজন্য বিবাহার্থে তাঁহার বয়ঃস্থা পাত্রী আবশ্যক। অদৃষ্ট বশতঃ আমি নিতান্তই বয়ঃস্থা হইয়া উঠিয়াছিলাম।—তোমরা শুনিলে কি বলিবে জানি না, আমার বয়স কিন্তু সত্য সত্যই সতর বৎসর ছাড়াইয়াছে। পল্লি-গ্রামের ভিতরে থাকিলে আমার মা'কে যে কতদূর অপদস্থ হইতে হইত, তাহা বিধাতাই জানিতেছেন! কলিকাতায় আছি বলিয়াই অনেক রক্ষা।

পাত্রের বন্ধুগণ "কনে" দেখিতে আসিয়া, আমার বয়স, চেহারা ইত্যাদি দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। একজন অপর জনকে জনান্তিকে বলিলেন "বেশ মেয়ে! নরেন বাবুর জন্য আমরা যে রকম মেয়ে চাই, ইটী সেই রকম সুপাত্রী বটে!" কথা "জনান্তিকে" হইলেও আমার কাণে গেল; আমি বড়ই লজ্জিতা হইলাম। তাঁহারা আমার এক-খানি ফটোগ্রাফ লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাকা দেখার পরে যথাসময়ে, যথা-নিয়মে আমাদিগের বিবাহ হইল। পিতৃ-হীনা কন্যার সহিত বিপত্নীকের বিবাহ, এজন্য ধুমধাম কিছুই হইল না। উভয় পক্ষের দুই চারি জন আত্মীয় বন্ধু আসিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিলেন মাত্র।

জামাতা দেখিয়া মা যারপর নাই সুখী হইলেন। বাবার কথা মনে করিয়া মা'র চোখের জল পড়িতেছিল; মা আমাকে বলিলেন "সরলা! ভগবানের কৃপায়, আর তোমার পিতৃদেবের পুণ্য-বলে তোমাকে এমন সোণার চাঁদের হাতে দিলাম!—আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হইয়া, স্বামীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া, মাতৃহীন বাছাদে'র মা হইয়া সুখে ঘরকন্না কর।" মায়ের কথা শুনিয়া আমারও চোখের জল উথলিয়া উঠিল; আমি মুখ ফিরাইয়া আঁচলের কোণ পাকাতেই লাগিলাম। মায়ের মুখ পানে চাহিতে পারিলাম না।

২

"শুভ দৃষ্টির সময়ে লোক জনের ভিতরে, আমি স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। লোকের উত্তেজনায় একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু উজ্জল, বিস্তৃত নয়নযুগল দেখিয়া তখনই আমার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; আমি কি দেখিলাম, বলিতে পারি না। তারপরে বিবাহান্তে, সমাগতা মহিলামণ্ডলীর মধ্যে, উজ্জল দীপালোকে কার্পেটের আসনে বসিয়া, তিনি যখন জল খাবার খাইতেছিলেন, তখনই অন্যের অজ্ঞাতে, অন্তরাল হইতে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম।

তাঁহার পরণে চেলী বা গরদাদি নহে, একখানি লালপেড়ে ধুতী। গলায় এক গাছি বেলফুলের হার, হাতে একটী আংটী। সাজসজ্জা কেবল এই মাত্র। আমি কালিদাসের শকুন্তলাও নহি, শেক্ষপিয়ারের মিরাণ্ডাও নহি; ইতিপূর্ব্বে কোনও মহাত্মাকে দেখি নাই এমন নহে; আমি শত সহস্র আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়াছি,—কলিকাতার রাস্তা পূর্ণ করিয়া যখন অসংখ্য লোক চলে, তখন সেই অগণ্য লোকশ্রেণী দেখিয়াছি, কিন্তু আজি যাহা দেখিলাম, তাহা এ জনমে দেখি নাই।—এমন স্নেহময়, পবিত্রতাপূর্ণ, স্নিগ্ধ, গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি আমি এ জনমে কখনই দেখি নাই! ইনি যখন আমাকে জীবনের অর্দ্ধভাগিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তখন আমার মত ভাগ্যবতী আর কে? সুখের উচ্ছ্বাসে আমার শরীর অবশ হইয়া গেল!

কিন্তু এ সংসারে মানুষের সুখের গর্ব্ব কতক্ষণ থাকে? সেই অপরিসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সহসা একটী কথা মনে হইয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—আমার মনে হইল "কালের অদম্য প্রভাবে, এমন স্বামীকে ছাড়িয়া যে রমণী অসময়ে চলিয়া গিয়াছে, তাহার মত হতভাগিনী আর কে? যাইবার সময়ে তাহার প্রাণ না জানি কতই কাঁদিয়াছিল। হয়তো সে অবসন্ন চক্ষু দুইটী পুনঃ পুনঃ সবলে খুলিয়া ঐ ভুবনমোহন মুখখানি দেখিতে চাহিয়াছিল! নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, আর পরস্বাপহারকের মত আমি তাহারই ধনে ধনী হইয়া আনন্দে দিশাহারা হইতেছি! আমার এই আনন্দের দিনে, সেই অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে দুইটী সজল চক্ষু, ঐ মনোহর মুখ খানির প্রতি চাহিয়া আছে কি না, কে বলিবে? আর আমার উপরে মর্ম্মভেদী, অভিসম্পাতপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বর্ষিত হইতেছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে? সে যাঁহাকে জীবনের বন্ধু, সংসারের সহায়, জগতের অবলম্বন বলিয়া প্রাণের প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, হায়! হায়! পাপিষ্ঠা আমি, আজি তাহার সেই সর্ব্বস্ব ধনকে কাড়িয়া লইলাম!—এত দিনে তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইল—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে কি বলে, তাহা জানি না, আমার কিন্তু মনে হয়, মানবের প্রকৃত

মৃত্যু দেহের পতনে নহে, প্রিয়জনের স্মৃতিতে যে জাগিয়া থাকে, সে চিরদিনই অমর। মনুষ্যজাতির ইতিহাসেই এ কথার সত্যতা বুঝা যায়। আজি এ বিস্মৃতি তো আমার জন্যই ঘটনা হইল!—কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি অবলা; কাহারও হৃদয় হইতে প্রিয়জনের স্মৃতি, প্রণয়ের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা আমার উদ্দেশ্য নহে; তবে আত্মরক্ষার্থে আমার শক্তিও নাই।—কিন্তু ছি, ছি, পুরুষেরা এত নির্ম্মম কেন? তাহারা কেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে? স্বর্গস্থ প্রিয়জনের উদ্দেশে প্রীতিবৃত্তি অনুশীলন করিলেও তো প্রণয়লিপ্সা চরিতার্থ হয়, তবে কেন নিষ্ঠুর পুরুষ স্বতন্ত্র পথ অনুসন্ধান করে?

বিবাহরাত্রে বাসরজাগার প্রথা অনেকের অনুমোদিত হইলেও আমার বাসর জাগিবার লোক মিলিল না। কেননা নিমন্ত্রিতা মহিলারা বিবাহের খানিকক্ষণ পরে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং তিনি ও আমি "নিরাপদে" বাসর-বাস করিতে গেলাম।

প্রথম দুই একটী সামান্য কথার পরে যখন তিনি আমার হাতের উপরে হাত রাখিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "সরলা! আমি এ জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, অনেক দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছি; আজি জগদীশ্বরের চরণে নির্ভর করিয়া তোমায় লইয়া আবার সংসারী হইতেছি; তুমিই আমার নিরাশার আঁধারে আবার আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছ! সরলা! তোমার এ হতভাগ্য স্বামীকে লইয়া তুমি প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে তো? যথার্থ সহধর্ম্মিণীর মত তোমার স্বামীকে ধর্ম্ম পথ দেখাইয়া দিবে তো? তখন আমি কি উত্তর দিব? সে স্নেহমাখা সুমধুর বিবাদোক্তি শুনিয়া আমার প্রাণ দ্রব হইয়া গেল; এতক্ষণ মনে যে সব কথার ঢেউ উঠিতেছিল, সে সব কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু মুখে একটী কথাও সরিল না!—বলিতে পারিলাম না যে, তোমাকে লইয়া যদি সুখী হইতে না পারি, তবে এ নারী-জীবনে ধিক্! বলিতে পারিলাম না যে, আমার দেবতা তুমি, তোমাকে "ধর্ম্ম পথ" আমি কিরূপে বুঝাইব? প্রভো! তোমার স্নেহের ছায়ায় এ দাসীকে রক্ষা করিও; তোমার চরণতলে স্থান পাইলেই এ দাসীর চতুর্ব্বর্গ মিলিবে!—তা ছাই, পোড়া মুখে একটী কথাও বলিতে পারিলাম না; কেবল দুইফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজলে সেই পদ্মফুলের মত হাতখানি ভিজিয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল; আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া উনি কি ভাবিতেছেন?—ছি, পোড়া চোখের জল পড়িয়া গেল কেন?

বিবাহের দুই দিন পরে আমি স্বামি-গৃহে চলিলাম। মা'কে এবং ভাই দুটীকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ যে কেমন আকুল হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীর সহিত গাড়ীতে বসিলাম। তাঁহার স্নেহের

সান্ত্বনা পাইয়া ক্রমশঃ চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম।

আমার পতিগৃহও কলিকাতায়। বাড়ীর কাছাকাছি হইলে স্বামী বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে তোমার নিজের বাড়ীতেই লইয়া যাইতেছি, সেখানে যাহা কিছু দেখিবে সে সব তোমারই; সরলা, সেই সব লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে তো?" কথাগুলি উনি যেন বড়ই আকুল হইয়া বলিতেছেন—আমার বুকে যেন সূচ ফুটিল; আমার মুখ দিয়া হঠাৎ কথা বাহির হইল, আমি বলিলাম "আমার সুখের জন্য তুমি অত ব্যস্ত হইও না, আমি ভগবানের নামে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়াছি, তোমার সুখেই আমার সুখ" এই কথা বলিতে বলিতে আমার আবার লজ্জা করিতে লাগিল। উনি কিন্তু বড়ই সুখী হইলেন।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিলে, ওঁর পিসীমা এবং দুই তিন জন সমাগতা মহিলা আমাকে লইয়া উপর তালায় গেলেন। আমার দিকে চাহিয়া পিসীমা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "মা! এস! জন্ম-এয়োতী হও; আমার সুরেন যতীনের মা নাই, তাঁদের সু নজরে দেখ। বাছাকে আমার পোড়া যম টেনে নিয়ে গেল, তার সাধের সংসার প'ড়ে রইল!—কোনও সুখভোগ কত্তে পেলে না—"

পিসীমা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। আর একজন মহিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন "সুখের কপাল না হ'লে কি কেউ সুখ কত্তে পারে মা? অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় ছিল বলেই তো ডাক্তার বাবুর অমন সতী লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে মরে গেল।" তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই অন্য একজন রমণী কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুর আর দুঃখ কিসের?—অমন সুন্দরী স্ত্রী পেলেন; দুদিনেই ডাক্তার বাবুকে ভুলিয়ে নেবে! সুরেন যতীনকে পর করে দেবে! —আমার কাছে বাবু, উচিত কথা—শাস্ত্রে বলে "সত্য কখনো মিথ্যা নয়, সৎমা কখনো আপন নয়" ইত্যাদি।

এই সব সমালোচনা ও মন্তব্য শুনিয়া আমার বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। স্বর্গীয়া সপত্নীর অকাল-মৃত্যু যেন আমিই ঘটাইয়াছি! আমি নীরবে বসিয়া মনে মনে রবি ঠাকুরের একটী কবিতার ভগ্নাংশ ভাবিতে লাগিলাম। কবিতা টুকু এই—

"ফুলের মালা গাছি, বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ!"

সমাগতা মহিলারা বিদায় হইলে, একজন ঝি দুইটী শিশুকে আনিয়া আমার কাছে দিল। ঝি বলিল "এই নাও, মাঠাকরুণ! তোমার ছেলেদের নাও; তোমার জিনিষ তোমায় দিলুম, আমরা খালাস পেলুম। যা, যা, সুরিন, যতীন, ঐ তোদের মা এসেছে; মা'র কোলে গিয়ে বোস্। মা এত দিন লুকিয়ে ছিল, আজ এল। যা! মা'র কোলে যা!"

শিশু দুটীর সুকুমার সৌন্দর্য্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। মরি, মরি, স্বর্গবাসিনি! এ সোণার পুতুল দুটীকে তুমি ফেলিয়া গিয়াছ বলিয়াই এ অমরপ্রার্থিত রত্ন "হতভাগা" পাইয়াছে। মা আমাকে "মাতৃহীনের মা" হইতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনের সর্ব্বস্ব দিলেও কি ইহাদের মায়ের অভাব ঘুচিবে? আমি হয়তো ইহাদের উপযুক্ত মমতা দিতেই পারিব না; ইহারা যে মাতৃহীন, সেই মাতৃহীনই রহিবে।

দুই ভাই চারিটী সতৃষ্ণ চক্ষু আমার মুখের উপরে স্থাপিত করিল। বুঝি যাহা ভাবিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা মিলিল না, যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না, তাহাদের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল!—তাহারা মুখের ভিতর আঙুল পূরিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল।

এতক্ষণ তবু সহিয়া ছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না—দুটী কচি প্রাণ আমার জন্য আঘাত পাইল, এ ব্যথা আমি আর সহিতে পারিলাম না। তখন চোখের জলে ভিজিতে ভিজিতে "বাপ, যাদু" বলিয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া কোলে বসাইলাম।

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে তাহারা আমার কোলে বসিল। যতীন ছোট, তাহার বয়স চারি বৎসর, সে তাহার দাদা সুরেনকে বলিল "এ মা তো সে মা নয় দাদা?" সুরেনের বয়স ছয় বৎসর; যতীনের কথায় সে খুব লজ্জিত হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিল "সে মা নয়, উনি আমাদের মা"। যতীন ভগ্নস্বরে আস্তে আস্তে বলিল "এ মাও কি আবার সে মায়ের মত চলে যাবে, দাদা?"

হরি! হরি! বাপধন! তোরাই স্বর্গের কুসুম। কত লোকে আমাকে তোদের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছে, আর তোরা আমাকে অমৃতময় ভালবাসা ঢালিয়া দিলি! আমি তোদের "সে মা নয়" সত্য, হয় তো তাঁর মত ভালবাসিতে পারিব না, ইহাও সত্য; কিন্তু এ ক্ষুদ্র বুকে যতদূর স্নেহ সম্ভব, তা' তোদেরি দিব। তোরা যাঁহার সেই অঞ্চলের নিধি, নয়নের তারা, বুকজুড়ান ধন, তিনি যে এ জগতে নাই, আর আমি যে বিধাতাকর্ত্তৃক তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, এ কথা আমি কখনই ভুলিব না। দশ জনে আমাকে যাহাই বলুক, তোদের আমি বুকের অতি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিব; যদি তোদের মত সোণার পুতুল দুটীকে "আপনার" বলিয়া মমতা করিতে না পারিব, তবে এ জগতে রমণী হইয়া জন্মিলাম কেন? আর তুমি স্বর্গীয়া দেবি! আমি তোমারই দাসী—এই শিশুদের উপরে তোমার যে সমুদ্রতুল্য অতলস্পর্শ স্নেহরাশি ছিল, তাহারই এক কণা আমাকে দান কর, আমার জীবন সার্থক হউক।

আহা! স্বামীকে ও সন্তানকে তিনি না জানি কতই ভাল বাসিতেন; কতই আদর করিতেন; ইহাদের সুখের জন্য

আমি কি করিব? কি করিলে ইহাদের সুখ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে? হে ঠাকুর! লোকে যাহাই মনে করুক, আমার মনে হয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিশেষতঃ "বিমাতা" হওয়ার চেয়ে নারী-জীবনে গুরুতর দায়িত্ব আর নাই, আর নাই!

৪

আমার বিবাহের পরে অনেক বৎসর গিয়াছে। এখন আমার নিজের তিনটী সন্তান; দুটী মেয়ে ননী ও মণি; একটী ছেলে তাহার নাম ক্ষিতীন্দ্র। আমি সত্য কথা বলিব, ননী, মণি ও ক্ষিতীন্দ্র আমার বড় স্নেহের জিনিস হইলেও আমার সপত্নীপুত্র সুরেন ও যতীনের উপরে আমার প্রাণের টান বেশী। ইহা আমি স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য কপটতা করিতেছি না—আমার সুরেন, যতীন যে মাতৃহীন, পরের মা'র হাতে যে উহাদের লালন পালনের ভার, সে কথা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে। তাই ঐ দুটীর জন্য আমার মন যেমন করে, আমার গর্ভজাত তিনটীর জন্য সে রকম করে না।

সুরেন খুব শান্ত ও সুবোধ; যতীন ছোটবেলা হইতে কিছু আব্‌দারে ছেলে; কিন্তু সেই জন্যই যতীনের প্রতি আমার মন বেশী আসক্ত।

আমার সুরেন ওকালতী পাশ করিয়া হাইকোর্টে উকীল হইয়াছে। খুব সদ্বংশ-জাতা ও সুলক্ষণা একটী মেয়ে আমার বৌমা হইয়াছেন। বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী; সে দিন ও পাড়ার রাম বাবুর স্ত্রী বৌমাকে না কি বলিয়াছিল "ও গো! তোমার সৎশাশুড়ী তো তোমায় যত্ন মমতা করে?" বৌমা আমার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, তার পরে বলিল "মা! তুমি ও মাগীকে এ বাড়ী আসিতে দিও না। তোমাকে সৎশাশুড়ী বলে।" বাপের বাড়ীতেও বৌমা থাকিতে চাহে না। সেখানে গেলে আট দশ দিন পরে আমাকে লেখে আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন কবে?" এমন সোণার বউমা কি কাহারও হয়? —উনি তো তামাসা করেন, বলেন "আমাদের মত বৌমাকেও তুমি যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে ফেলেছ।"

এবার যতীন অনেকদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছিল, তাই উনি তাহাকে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে দেওঘরে পাঠাইয়াছেন। আজি যতীন আমাকে পত্র লিখিয়াছে; পত্র এই—

"মা! আমার শরীর অনেক সুস্থ ও সবল হইয়াছে। আমি হাঁটিয়া তপো-গিরিতে ও নন্দন পাহাড়ে উঠিয়াছি। শিবগঙ্গায় সাঁতার দিয়াছি। কিন্তু মা! তুমি এখানে নাই বলিয়া আমার কিছুই ভাল লাগে না। বাবাকে বলিও আমি শীঘ্র বাড়ী যাইব, নচেৎ তুমি এখানে এস। আজি ২ মাস তোমাকে দেখি নাই, ইহাতে আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে।"

পত্র শুনিয়া আমি চক্ষু মুছিলাম, উনি হাসিলেন। নির্জ্জনে দেখা হইলে

উনি আমাকে বলিলেন "সরলা! কত জন্মের পুণ্যবলে তোমাকে পাইয়াছি, জানি না; সত্য সত্যই তুমি মাতৃহীনের মা হইয়া এ সংসার সোণার সংসার করিয়াছ! আমাকে কৃতার্থ করিয়াছ!"

ছি! ছি! ও কি পোড়া কথা! তাড়াতাড়ি ও'র পায়ের ধুলা একটু মাথায় দিলাম।

লেখিকা

শ্রীমা।

প্রবাসী পুত্রের মাতা।

১

আপন জীবন-ব্রত করিতে সাধন,
গিয়াছে প্রবাসে তাঁর নয়নের মণি;
না পেয়ে সংবাদ তার, চিন্তাকুল মন,
বিরলে নয়নধারা ত্যজেন জননী॥

২

যে পথে গিয়াছে পুত্র সেই পথ পানে
চাহিয়া জননী দিন করেন যাপন;
উন্মাদিনী সম, আহা! ছুটেন সেথানে
যেথানে পুত্রের নাম করে কোন জন॥

৩

পশি দেবালয়ে কভু, যোড় করি কর,
মাগেন সজল আঁখি সুতের কুশল;
কহিতে পুত্রের নাম রুদ্ধ হয় স্বর,
বিশুষ্ক কপোল বহি ঝরে নেত্রজল॥

৪

কতই নিশীথ মা'র কাটে জাগরণে,
স্বপ্নাবেশে কতদিন কাঁদেন জননী,
কতবার পদশব্দ শুনিয়া অঙ্গনে
জিজ্ঞাসেন দ্বার খুলি, "এলে বাছমণি!"

৫

পাকিলে উদ্যানে ফল, আসিবে তনয়
ভাবিয়া জননী তুলি রাখেন যতনে,
কত অন্ন জননীর পর্য্যুষিত হয়;
কতবার রচি শয্যা কাঁদেন বিজনে॥

৬

কত দিন, কত মাস, কত সংবৎসর,
এইরূপে গেল চলি; পুত্রের সংবাদ
না আসিল, আঁখি মার ঝরে ঝর ঝর;
ভাবেন বিধাতা বুঝি ঘটা'ল প্রমাদ॥

৭

একদিন জননীর কোন আত্মজন,
কহিল তাঁহারে আসি, "তনয় তোমায়
রহেছে যথায়, শুনি পান্থ একজন
আসিয়াছে সেথা হ'তে, পাবে সমাচার॥"

৮

আলু থালু কেশ বাস, ছুটিলা জননী
যথায় পথিক সেই, জিজ্ঞাসিলা তায়,
"হেরেছ কি তুমি মোর নয়নের মণি?
কি বলেছে বাছা তার অভাগিনী মায়?"

৯

উত্তরিলা পান্থবর, তব পুত্র সনে
নাহি ছিল ভদ্রে, মোর পূর্ব্ব পরিচয়,
সংবাদ তাঁহার তবে কহিব কেমনে?
বিশাল সে পুরী, ক্ষুদ্র গ্রামত সে নয়॥

১০

বড় সাধে বাদ বিধি করিল ঘটন,
নিরাশ জননী, তবু প্রবোধিয়া মনে
উথলিত অশ্রুধারা করি সম্বরণ
কহিলা পথিকে ধীর মধুর বচনে ॥

১১

"পরিচয়ে, পান্থবর, নাহি প্রয়োজন,
নিজগুণে পরিচিত তনয় আমার.
যে দেশে যেখানে থাক্ সেথা সর্ব্বজন
চিনিবে তাহারে, জানি ব্যবহার তার ॥

১২

বীরত্বে, ধীরত্বে, প্রেমে, আত্মবিসর্জ্জনে
থাকে যদি পরিচিত সেথা কোন জন,
বল শুনি, কার্য্য তার বিচারিয়া মনে,
বুঝিব সে বটে কি না আমার নন্দন ॥"

১৩

কহিলা পথিক, মনে মানিয়া বিস্ময়,
"হেন বাণী কভু, দেবি, শুনি নাই আর
কোন জননীর মুখে ;—বুঝিনু নিশ্চয়
নহে সে অযোগ্য পুত্র হেন মাতা যার ॥

১৪

হেরিয়াছি সেথা, এবে কহিব তোমায়,
ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে, অশনি সমান
গর্জ্জিছে কামান যথা, বিদ্যুতের প্রায়,
ঘুরিছে ঝলসি আঁখি, উলঙ্গ কৃপাণ ॥

১৫

রুধিরে বহিছে স্রোত, আহত মানব
তৃষায় আকুল কণ্ঠে করিছে চীৎকার,
ছিন্ন অঙ্গ, ছিন্ন দেহ লুটিতেছে শব,
রণমত্ত সেনাদল গর্জ্জে 'মার মার' ॥

১৬

দাঁড়ায়ে সে রণক্ষেত্রে যুবা একজন,
ক্ষতদেহে রক্তস্রোত ছুটিতেছে হায়!
দৃঢ় করে ধরি বীর জাতীয় কেতন
যুঝিতেছে রণে যেন মত্তসিংহ প্রায় ॥

১৭

অগণ্য অরাতিসৈন্য ঘেরি বীরবরে
কাড়িয়া লইতে কেতু করে প্রাণপণ,
কিন্তু হেন শক্তি কার? বাঁধা বজ্র করে;
ভঙ্গ দিয়া রণে শেষে ধায় শত্রুগণ ॥

১৮

জয়োল্লাসে বীরবর প্রবেশে নগরে,
হর্ষে মগ্ন পুরবাসী করে যশোগান,
নিজে অগ্রসরি রাজা মহা সমাদরে
জয়মাল্য দিয়া বীরে করেন সম্মান ॥

১৯

সেই কি তনয় তব কহগো জননি,"
জিজ্ঞাসিলা পান্থ ; মাতা করিলা উত্তর,
"এ হেন তনয় যাঁর ধন্য সে রমণী,
কিন্তু, পান্থ, পুত্র মম আর(ও) গুণধর ॥"

২০

বিস্মিত পথিক, কহে, "হেরেছি নয়নে
একদা বৈশাখশেষে নীল জলধর
ব্যাপিয়াছে ব্যোমদেশ, গরজি সঘনে
ছুটিছে অশনি বেগে বিদারি অম্বর ॥

২১

ঝলসিয়া আঁখিযুগ চমকে দামিনী,—
হুহুঙ্কারি ঘোর রবে বহে প্রভঞ্জন,
সন্তাড়িত বায়ুবলে ধায় প্রবাহিণী
উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী করি প্রদর্শন ॥

২২

হেন কালে তরী এক তটিনীহৃদয়ে
করিতেছে টলমল ; পোতারোহিগণ
'সামাল, সামাল' বলি ডাকিছে সভয়ে
গেল বুঝি গেল তরী হ'ল নিমগন ॥

২৩

আসিছে তরঙ্গ ওই রক্ষা নাহি আর,
ডুবিল, ডুবিল তরী, ডুবিল অতলে ;
মাতৃক্রোড়ে ছিল এক শিশু সুকুমার
কোথা গেঁাহে? হের ওই ভাসিতেছে জলে!!

২৪

নিমগ্ন, অদৃশ্য তরী ; পোতারোহিগণ
আপন আপন প্রাণ রক্ষিবারে হায়!
রজ্জু, কাষ্ঠ যাহা হেরে করে আরোহণ,
অপরের পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥

২৫

কিন্তু, কে যুবক ওই, বদ্ধপরিকর,
বাম হস্তে জননীর বাঁধিয়া বসন,
দক্ষিণে শিশুরে তাঁর তুলি অংস'পর
চলিয়াছে তীরমুখে করি সন্তরণ ॥

২৬

ফেনিল তরঙ্গমালা বক্ষদেশে তাঁর
করিছে আঘাত বলে, তবু অবিরল
সন্তরি চলেছে যুবা, রোধে সাধ্য কার?
ক্লান্ত বাহু, তবু তাহে ঐরাবত-বল ॥

২৭

কূলে উপনীত ক্রমে ;—শত কণ্ঠস্বরে
উঠে চারি দিক্ হ'তে জয় জয় ধ্বনি,
কেহ নমে পদে, কেহ আশীর্ব্বাদ করে,
সেই কি তনয় তব কহগো জননী ?"

২৮

চিন্তি ক্ষণকাল মাতা করিলা উত্তর
"না পারি বুঝিতে আমি কেবা এইজন,
সংশয়ে আকুল চিত্ত ; কিন্তু পান্থবর,
আর (ও) কিছু থাকে, বল, করিব শ্রবণ ॥

২৯

কহিলা পথিক ; "দেবি, হেরেছি নয়নে
প্রশান্ত, নিভৃত সেথা, আশ্রম শোভন,
ক্ষুদ্র প্রবাহিণী এক কুলু কুলু স্বনে
বহে সে আশ্রম-অঙ্গ করি প্রক্ষালন ॥

৩০

প্রভাতে মধুরভাষী বিহঙ্গনিকর
গায় সেথা বিভুগুণ হরষিতমনে,
আপনি চন্দ্রমা, নিজে দেব.দিবাকর
সাজান সে পুণ্যাশ্রম কনক কিরণে ॥

৩১

মল্লিকা-সুবাসে সেথা দিক্ আমোদিত,
বিভূষিত তরুরাজি মরকতসাজে,
সুন্দর কুটীর কত পর্ণ আচ্ছাদিত,
শোভে শ্রেণীবদ্ধ সেই আশ্রমের মাঝে ॥

৩২

অনাথ আতুর মহাব্যাধিগ্রস্ত জন
সে আশ্রমে করে বাস ; প্রশান্ত-মূরতি
যুবা এক তা সবায় করেন পালন
বিসর্জ্জিয়া' নিজসুখ পরহিতে মতি ॥

৩৩

পূতিগন্ধে লোক যার যায় পলাইয়া,
কৃমি কীটে ক্ষত যার দংশে অনুক্ষণ,
হেন জনে ক্রোড়ে যুবা যতনে তুলিয়া
স্বকরে ঔষধ নিত্য করেন লেপন ॥

৩৪

কত কাল গত, তবু অক্লান্ত যুবক
নীরবে জীবনব্রত করেন পালন ;
অনাথের পিতা, প্রভু, সুহৃদ, সেবক ;
না জানে, না চেনে তাঁয় জগতের জন ॥

৩৫

দ্বাদশ বরষ হেন গত ধীরে ধীরে,
অচিন্ত্য বিধির লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
প্রবিষ্ট সে রোগ এবে যুবার শরীরে,
কে জানিবে দণ্ড ইহা কিম্বা পুরস্কার !

৩৬

নাহি তাঁর এবে সেই কান্তি নিরমল,
স্ফীত কর, পদ ; রোগে জীর্ণ কলেবর ;
কর্ত্তব্যসাধনে যুবা তবু অবিচল,
সে সহাস্য মুখচ্ছবি তেমন (ই) সুন্দর ॥

৩৭

সঙ্গে লয়ে স্নেহভরে ব্যাধিগ্রস্তগণে
করেন আনন্দে যুবা হরিগুণ গান ;
দিবানিশি এই মন্ত্র জপ মনে মনে
'হ'ক্ প্রভো, হ'ক্ এই বিশ্বের কল্যাণ॥'

৩৮

দেবব্রত নাম তাঁর মানবসমাজে
না জানে, না চেনে কেহ ; কে করে আদর ?
একাকী বিরলে যুবা রত নিজ কাজে,
সাক্ষী মাত্র সুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর॥"

৩৯

নীরব পথিক , মাতা ধ্যানমগ্ন প্রায়
আছিলেন এতক্ষণ, বিষাদ আঁধার
ক্ষণেক সে মুখচ্ছবি ঢেকেছিল হায় !
মেঘমুক্ত শশিসম শোভিল আবার॥

৪০

সম্বোধি পথিকে ধীর মধুর বচনে
কহিলা জননী ; "পান্থ, না করি সংশয় ;
অপূর্ব্ব চরিত তার শুনিয়া শ্রবণে
বুঝিনু যুবক সেই আমার তনয়॥

৪১

সুখে থাক্ বাছা মোর করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হ'ক্ বাঞ্ছা তার বিধাতার বরে ;
এত দিনে বিধি মোর পূরাইল সাধ,
ধন্যা হ'নু হেন পুত্রে ধরিয়া জঠরে॥"

৪২

সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা হরি করিয়া স্মরণ,
নিশ্চিন্ত ফিরিলা মাতা আপন ভবনে ;
সেই দিন হতে আর কভু কোন জন
না হেরিলা অশ্রুবিন্দু মাতার নয়নে॥

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

২য় প্রস্তাব।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কতকগুলি শুভ ফলের বিষয় যদ্রূপ বর্ণিত হইল, তদ্রূপ দুই চারিটী অশুভ ফলের বিষয়ও বলা কর্ত্তব্য।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব—যৌবন-

কালে অনেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী হয়; তখন অভিভাবকের অধীনে বাস করা মঙ্গলজনক। কিন্তু চরিত্র গঠিত হইলেও যদি সমস্ত স্বাধীনভাব পরিবর্জ্জন করিয়া, একমাত্র অভিভাবকের আজ্ঞানুসারেই চলিতে হয়, তবে কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

একান্নভুক্ত পরিবারে প্রত্যেকেই কৃতী ও উপার্জ্জনশীল হইতে সচেষ্ট থাকে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কোনও অভাব বোধ করিতে পারে না। যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অভাবই উন্নতির প্রসূতি।" মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, অভাবে পতিত হইলে তন্নিবারণার্থ সে অধিক ব্যাকুল হয়। নতুবা শুধু স্বীয় উন্নতিবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প লোকই ব্যগ্র হয়।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারে দুই কি তিন জন মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি থাকেন। অপরাপর সকলেই পোষ্যবর্গ। একটী বৃহৎ পরিবারে যদি দুই কি তিন জনের উপর জীবিকার সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তবে সে পরিবারে দরিদ্রতা অনিবার্য্য। পরিবারস্থ সুস্থকায় ব্যক্তিমাত্রই যদি উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা না করে, তবে একে অপরের গলগ্রহস্বরূপ হয়। কাজে কাজেই সে পরিবারে ক্রমশঃ দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়।

একান্নভুক্ত পরিবারের শুভাশুভ ফলের বিষয় বর্ণিত হইল। যে পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তি এই অশুভ ফলগুলি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভে ও পরস্পরের উন্নতিকামনায় যত্নশীল হয়, সেখানে নিশ্চয়ই সুখশান্তি বিরাজ করে। যে পরিবারে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, সেখানে সুখশান্তি তিষ্ঠিতে পারে না, এবং পরিবার অচিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন শ্যাম সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে জলের অব্যবহিত উপরের সোপানে উপবিষ্ট হইয়া একটী ফুলের মত সুন্দরী বালিকা কি চিন্তা করিতেছিল। পুষ্পসুরভি-সমাকুল সায়াহ্নসমীর-সেবিত নদীতটে সে শান্ত চিন্তাশীলা বালিকাকে প্রকৃত সুরসুন্দরী বলিয়াই প্রতীত হয়।

সম্মুখে অনন্তকাল প্রবাহিণী নদী মৃদু নিনাদ করিতে করিতে অনন্তের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, সন্ধ্যাসমীরে উচ্ছ্বসিত লহরীমালা বালিকার পবিত্র পদপ্রান্তে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াই যেন আনন্দানুভব করিতেছে। সেইখানে একটী ছোট বকুল গাছে একটী ছোট পাখী "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" বলিয়া সান্ধ্য জগৎকে কম্পিত করিতেছিল। কিন্তু কৈ সে গগনভেদী চীৎকারেও বালিকার সে গভীর চিন্তা ভগ্ন হইল না।

সেই সময়ে বালিকার পশ্চাৎ দেশে একজন লোক দণ্ডায়মান হইয়া বালিকার শ্বেত গোলাপের ন্যায় সুন্দর মুখখানি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিল, বালিকা তাহা জানিতে পারে নাই।

বালিকা অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সেই বকুলবৃক্ষের নীচে গেল,কিন্তু সে দিন আর ফুল কুড়ান হইল না। যে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল, বালিকা তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বকুলতলে একজন সুন্দর যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল, বালিকাকে এই অবস্থায় কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মুখ আপনা আপনি খুলিয়া গেল। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল "বালিকে! তুমি কি কাঁদিতেছ? বল দেখি নদী-সোপানে বসিয়া বসিয়া প্রত্যহ তুমি কেন চিন্তা কর? তুমি কি আমাকে বলিতে পার এ চিন্তা তোমার কাহার জন্য? যুবার সেই করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে বালিকার সরম সম্ভ্রম কোথায় চলিয়া গেল, বালিকা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সেই মুখেই যেন সে পৃথিবীর সমস্ত শোভা সমাবেশ দেখিতে পাইল, সেই মুখের সম্মুখেই যেন তাহার সপ্তস্বর্গ খুলিয়া গেল, সে যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গিয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে বুঝিল না যে, সে এমনি ভাবে চাহিয়া আছে। যুবা পুনরায় কহিল "তুমি কাহার জন্য চিন্তা কর?"

বালিকা কহিল, "তেজকুমারের জন্য।" সে যে এ কথা কহিল তা যেন সে জানিল না।

তেজ। তোমার নাম কি?

বালিকা। সুভগা।

তেজ। তোমাদের গ্রামের নাম কি?

বালিকা। ছায়াপথ।

তেজ। তেজকুমার তোমার কে? আমি তাহাকে চিনি।

বালিকা কহিল "না না, তুমিই তেজ-কুমার, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।"

তেজকুমারের হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল। বালিকার চক্ষুও আবার অশ্রুপূর্ণ হইল, তৎকালে সন্ধ্যার আঁধারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, সন্ধ্যার শীতল বাতাস বকুলতল দিয়া হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে-ছিল, নবজল-ধৌত শ্যাম দূর্ব্বাদামের উপর ফুটন্ত বকুল ফুল পড়িয়া পড়িয়া বকুলতল ছাইয়া গেল। সেইখানে বসিয়া তেজকুমার ও সুভগা উভয়ে উভয়ের নিকট বহুদিন-কার প্রাণের কথা কহিতে লাগিল।

তেজ। শুভে, তুমি কেমন আছ?

জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়। সুভগা! তোমার কি—

সুভগা। (তেজকুমারকে কথা কহিতে না দিয়া কহিল) জিজ্ঞাসা আর কি করিবে? আমি শুনিয়াছি আমি বিধবা। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে আমি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। পাত্রস্থ করিলে অন্যের অদৃষ্টে বাঁচিয়া উঠিব, এই আশায় আত্মীয়েরা আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমি যথার্থই সুস্থ ও সুখী হইলাম। কিন্তু সে সুসময় আর ফিরিয়া পাইলাম না। শুনিলাম আমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি বিধবা। তেজকুমার! তুমি বলিয়াছিলে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, তবে কেন আর ফিরিয়া আসিলে না? তুমি চলিয়া গিয়েছ, সেত অনেক দিনের কথা। আমি সেই অবধি কেবল তোমাকেই ভাবি, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার স্বামী। তবে আমি কাহার দোষে বিধবা হইলাম?

বালিকার সাশ্রুনয়ন দেখিয়া ও কাতরবাণী শুনিয়া উদারচেতা যুবকের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। তেজকুমার এই বালিকাকেই ভাল বাসিত—পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলে এই বালিকাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল। এই বালিকার সঙ্গে সে পূর্ব্বে সরলভাবে বসিয়া কত কথা কহিত, খেলা করিত, কত সুখের আশা দিয়া ইহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিত, এই বালিকার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া সে কত না কষ্ট পাইয়াছে। আজ সেই দশম বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পঞ্চদশ বৎসরের যুবতী নামে অভিহিত, কিন্তু এখনও তাহাকে ভুলে নাই। যখন নির্জ্জন কুসুমোদ্যানে বা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভ্রমরা-ভর-স্পন্দিত শ্বেত পুষ্পের ন্যায় চঞ্চল অমরালোক-সজ্জিত এই বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি চিন্তা করিত, তখন কি ইহা জানিত যে এত অল্প দিনের মধ্যেই এই নিদারুণ ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হইবে? এইরূপ অনেক ভাবিয়া অনেকক্ষণ পরে তেজকুমার কহিল "সুভগা, আমিই তোমার সমুদয় কষ্টের মূল।"

সুভগা। না না, আমার কর্ম্মানুযায়ী ফল আমাকে ভুগিতেই হইবে।

তেজ। সুভগা, তুমি হয়ত কত সময় আমাকে নির্দ্দয় পশু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ। কিন্তু যদি জানিতে ইদানীং আমার সমস্ত সময় কত কষ্টে গিয়াছে, তাহা হইলে এ অভাগার জন্য তোমার চক্ষেও জল বহিত।

আগ্রহে সুভগা কহিল "তেজকুমার! তবে কি তুমি বড়ই কষ্টে ছিলে?"

তেজ। সেই সব পুরাণ কথা আজ তোমার নিকট কহিব, শ্রবণ কর।

আমাদের গ্রামে কৃষ্ণকুমার নামে একজন বিখ্যাত জমীদার বাস করেন। হরিবল নামে তাঁর একজন প্রধান দেওয়ান আছে। আমার পিতা হরিবলের কাছে একটী চাকরী চাহিয়াছিলেন। হরিবল সেই জমীদারের

সংসারে নিজের অধীনে পিতাকে একটী নায়েবি কাজে বহাল করিয়া দিল। কিছুদিন পরেই পিতার এমনি সুযশ সুখ্যাতি বাহির হইতে লাগিল যে, তাহাতে হরিবলের যত্ন-রক্ষিত পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত যশোরাশি ম্লান হইয়া গেল। দিন দিন পিতা সেই জমিদারের প্রিয় হইতেছেন দেখিয়া দুরাশয় হরিবলের পাপহৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। সে তদ্বিরুদ্ধে নানারূপ অমোঘ অস্ত্র-কৌশল প্রয়োগ করিতে স্থিরসংকল্প হইল।

হরিবল সর্ব্বদাই জমীদারের নিকট পিতার মিথ্যা দোষ কীর্ত্তন করিত। তাহার পর যে কি হইল, তাহা আর আমরা কিছু বুঝিলাম না; কিন্তু পিতা ক্রমে ক্রমে জমীদারের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অবশেষে একদিন তিনি পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দিলেন। পিতা তাঁহার নিকট হইতে আপনার মাহিয়ানার উপরে অনেক টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন। জমীদার এই সুযোগে সেই সব অর্থ পিতার নিকট চাহিয়া বসিলেন। কহিলেন "যদি তুমি তিন দিনে এই অর্থ দিতে না পার, তবে তোমাকে পুলিশের লোক দ্বারা ধরাইব।" আমরা তাঁহারই ভূমিতে বাস করিতাম। তিনি আমাদিগকে হয় টাকা দিতে, না হয় তাঁহার ভূমি হইতে তন্মুহূর্ত্তেই উঠিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা টাকা কোথায় পাইব? তাহার অর্থ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, সুতরাং সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য এক জনের ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। হরিবলের পরামর্শ মত ও তৎপ্রদর্শিত জঘন্য কার্য্যের অনুসরণ করিয়া যাহার ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেও আমাদিগকে আপন ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিল। এই-রূপে হরিবলের তাড়নায় আমরা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন রাত্রিকালে হরিবলের এক জন চাকরের অন্য মনুষ্য কর্ত্তৃক আহত রক্তাক্ত শবদেহ আমাদের শয়নগৃহের সম্মুখে পতিত ছিল। আমরা শত্রু কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া মহা ভয়াকুল চিত্তে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া তৎসমুদয় ভয়াবহ কর্ম্ম দেখাইলাম। হরিবল আমার পিতাকে দোষী করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বার বার চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল "পিনাকী আমাকে ও আমার পুত্রকে হত্যা করিতে না পারিয়া অবশেষে আমার ভৃত্যকেই হত্যা করিয়াছে, অতএব আজই ইহাকে আদা-লতে যাইতে হইবে।"

যে দিন তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যোগী ছিল, সেই দিন আমরা কোন একটী বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়া এই দিকে পলাইয়া আসিয়াছি ও একটী অরণ্যের ভিতর একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বস-বাস করিতেছি। আমরা যাহাতে অন্য দেশে পলাইয়া যাইতে না পারি, এজন্য দুষ্টমতি হরিবল স্থানে স্থানে গুপ্তচর

প্রেরণ করিয়াছিল। পথিমধ্যে দৈব-দুর্য্যোগে যখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই সময় কোন নৃশংস আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। বোধ হয় সে হরিবলের চর হইবে, কিন্তু তখনও আমরা দৈব অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিলাম। এই জমীদারের কাজেই পূর্ব্বে পিতা আমদিগকে লইয়া ছায়াপথ আসিয়াছিলেন। এইখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানারূপে বিপদে পতিত হই। সুভগা, এই কষ্টই আমাদের চরম সীমা নহে। আবার সেফালি সেই হরিবলের পুত্র মুকুলকে ভালবাসে, এদিকে পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে দিবেন না। ওদিকে সেফালির সেই পাণ্ডুমুখ ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।

সুভগা। আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি, সেফালি সেই হরিবলের পুত্রকে ভালবাসে?"

তেজ। হাঁ মুকুলকে পূর্ব্বে আমরা এক-জন সাধু লোক বলিয়াই জানিতাম। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার যেন ধর্ম্মা-নুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত।

সুভগা। না না, সে বিষম ধর্ম্মান্ধ, না হইলে এমন অবস্থায় সে নিরপেক্ষ রহিবে কেন?

তেজ। সেফালি তাহাকে ভালবাসে, সেও সেফালিকে ভালবাসিত, কিন্তু এই সব ঘটনার পর হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আমাদের কুটীর হইতে ছায়াপথ এত কাছে। হঠাৎ এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এই দিকে আসিয়া পড়িলাম। প্রথমে একটী আম্রবৃক্ষের নীচে তোমার মাতার সহিত আমার দেখা হয়। সে দিন ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু তাহার পর দিনই আবার আসিলাম। এই বকুলতলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমায় দেখিতাম, যথাসময়ে আবার ফিরিয়া যাইতাম। সরলে, এত দিন তোমাকে পাইব আশা ছিল, আজ তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া সুভগা কহিল, "তেজকুমার! বিধির বিধান কি কেহ খণ্ডন করিতে পারে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন তোমার জীবনের সুখের পথ দেখ।"

তেজ। সুখের কথা আর মুখে আনিও না, আমা হইতেই তোমার এ দুর্দ্দশা, তাহা কি এ জীবনে ভুলিব?

সুভগা। আমি বিধবা, বিধাতার অভি-প্রায় আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতেই হইবে। তুমিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

তেজ। সুভগা, বিধবা বিবাহ—

তেজকুমারের কথায় বাধা দিয়া সুভগা কহিল, ছি ছি। স্ত্রী জাতির একটী মাত্র বিবাহ, বিধাতার কি ইহাই নিয়ম নহে?

তেজ। তোমার সমস্ত জীবন দুঃখময় হোক্ বিধাতার কি ইহাই ইচ্ছা?

সুভগা। হাঁ, তাঁহার তাহাই ইচ্ছা

না হইলে এই বয়সে এরূপ হইবে কেন? অবলা জাতি দুর্ব্বলা হইলেও বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য পালনে পরাঙ্মুখ বা ভীত নহে। সধবার স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠতম সুখ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই সার স্বর্গ-সুখ। এই ধর্ম্মই বিধবাদের ধ্রুব সত্য ধর্ম্ম। অতএব তেজকুমার আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমি আর বিবাহ করিব না।

তেজ ভগ্নহৃদয়ে কহিল "তবে তুমি কি ভাবে কোথায় থাকিবে?"

সুভগা। বিবাহ ছাড়া নারীজীবনে অনেক কাজ করিবার আছে। তেজ-কুমার, আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি। আজ কি তুমি আমাকে সৎ উপদেশ দিবে না? রমণী বিধবা হইলে সমস্ত মানব-জগতের হেয় হয়, কিন্তু তখনও প্রাণের দেবতার নিকট মনের বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি তেজকুমার,—

সুভগাকে কথা কহিতে না দিয়া তেজ-কুমার কহিল, সুভগা, সুভগা, আমি হিন্দুবিদ্বেষী নহি, বা নৃশংস নহি, তুমি স্বর্গের পরী। আমি জড়জগতের কীটাণু-কীট, তোমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার আমার অধিকার কি? আশীর্ব্বাদ করি তুমি দেববলে তেজস্বিনী হও, ক্ষুদ্র মানবের প্রেম বিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেমে নিমগ্ন হও। তোমার সমস্ত জীবন অদ্ভুত আনন্দরসে পরিপ্লুত হোক্। জানিও আমি কখনও তোমাকে ভুলিতে পারিব না। সুভগা, তুমি মহামহিমাময়ী, সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টা কুসুমময়ী দেবী; নিগূঢ়তম অন্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া সদ্যপ্রসূত অশ্রুসলিলে ধৌত করিয়া আমি তোমাকেই পূজা করিব। বাহ্য জগতে উভয়ের সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইল—হোক্, তাহাতে ক্ষতি নাই।

সুভগা দৃঢ় স্বরে কহিল, তেজকুমার তবে তাহাই হোক্; তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আত্মরূপ উঠাইয়া লও। মন করায়ত্ত করা সহজ কাজ নহে, তুমি মানব, মানব চিরকালই আত্মবিরোধী, অস্থিরচেতা.

তেজ। তোমার কথায় আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সম্মতি জানিবে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমি চলিলাম, চিরদিনের মত চলিলাম। তেজকুমার তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুভগা মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনায় মুমূর্ষুবৎ সেই বকুলতলে বসিয়া রহিল, তাহার পরে অনেক রাত্রে "শুভ ইচ্ছার ও সাধু সঙ্কল্পের ঈশ্বর সহায় হইবেন" বলিয়া উঠিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

এই ঘটনার পর হইতেই সুভগা পরহিত-ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

যোদ্ধা পরিবার।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্পেনরাজ্য মুর বা আফ্রিকাদেশীয় যবনদিগের হস্তগত হইয়াছিল। সীড্ নামে প্রসিদ্ধ স্পেন-দেশীয় এক বীরপুরুষ ইহাদিগকে দেশ হইতে বারবার দূরীভূত করিয়া দেন, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া দেশের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। সীড্ অর্থে পরাক্রমশালী অসমসাহসী যোদ্ধা। মুরেরা আপনাদিগের বিপক্ষ সেনাপতির বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম রডেরিগো ডায়েস্। ১০৪০ এক হাজার চল্লিশ সালে বীডার্ দুর্গের নিকট বর্গোনামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১০৯৯ সালে ভালেন্সিয়া নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মুরদিগের সহিত যুদ্ধে ইহাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়, এবং মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইনি তাহাদিগের হস্ত হইতে ভালেন্সিয়া নগর উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রতি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করাতে তাঁহার নাম মুরদিগের নিকট অত্যন্ত ভীতিজনক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ সমর-সজ্জায় সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ মহোৎসাহে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পত্নীও বীরাঙ্গনা ছিলেন। জীবদ্দশায় স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অনেক যুদ্ধে তিনি তাঁহার সহকারিতা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণী ভালেন্সিয়া নগর তিন বৎসর কাল স্বীয় অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন; অবশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাষ্টাইল নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, এবং তথায় ১১০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বীর দম্পতীর দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। ইহাঁদের সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সন্তানেরাও অনুপ্রাণিত হইয়া মুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং দেশের উদ্ধার সাধনে আপনাদিগের প্রাণ আহুতি দিয়াছিল। ইহাঁদিগের উপাখ্যানে সত্যের সহিত অনেক কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। যাহাহউক সীড্ আদর্শ খৃষ্টীয় বীর বলিয়া দেশবাসীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ। তিনি যেমন যুদ্ধে অজেয় ছিলেন, সেইরূপ চরিত্র অংশে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

তাসের ঘর।

বালকেরা তাসের ঘর প্রস্তুত করিয়া খেলিয়া থাকে, তাহাতেই তাদের অপার আনন্দ—তাহাতেই তাহারা এককালে মগ্ন হইয়া যায়। সেই তাসের ঘরকে প্রকৃত ঘরের ন্যায় ভাবিয়া তাহারা সেই ঘর নির্ম্মাণ করে ও অতি যত্নে তাহার মধ্যে পুতুল শোয়াইয়া রাখে। যাহাতে সেই ঘরে বিন্দুমাত্র বাতাস না লাগে, যাহাতে সেই ঘর অতি সন্তর্পণে রক্ষিত হয়, তাহারা সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করে। একটু বাতাস বা ধাক্কা লাগিয়া যদি তাহাদের সেই সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ত্রস্তে ব্যস্তে তাহার সংস্কার করে ও আবার যাহাতে না পড়িয়া যায় তাহার চেষ্টা করে। যদি পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গে, তবে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না—তাহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আমাদের এই সংসার—এই ভবের খেলা—ইহাও কি ঠিক্ সেইরূপ নহে? বালকেরা যেমন তাসের ঘর ও পুত্তলিকা লইয়া মাতিয়া থাকে ও তাহাতে ডুবিয়া যায়, আমাদের অবস্থাও জ্ঞানের চক্ষে চাহিয়া দেখিলে ঠিক্ সেই-রূপ বোধ হইবে। আমরাও ভবের খেলায় মত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকি, স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি যে, কোন ক্রমেই তাহা হইতে মুক্ত হইবার আশা থাকে না। যদি সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আমাদের তাসের ঘর একটু নড়িয়া উঠে, তবে ভয়ের ও ভাবনার সীমা থাকে না—চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করি। যদি দৈবক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে দুঃখে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি,—জীবনের আর অবলম্বন থাকে না। বালক বালিকাদের তাসের ঘর ভাঙ্গিবার পর তাহাদিগকে রোদন করিতে দেখিলে তখন আমাদের হাসি পায়। তাহাদের অসার অকারণ রোদন প্রায় আমাদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। কিন্তু ভুলিয়াও ভাবি না যে, আর এক মুহূর্ত্ত পরে আমাদের তাসের ঘরের জন্য হয়ত আমরা সেইরূপ বা ততোধিক ব্যাকুলান্তরে কাঁদিব। তখন একবারও নিজের হাস্যের কথা মনে হয় না। কেহ যদি আমাদের ক্রন্দন দেখিয়া তদ্রূপ হাস্য করে, তাহার অমানুষিক ব্যবহারে তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণাই জন্মে। একবার ভাবিয়াও দেখি না কেন এ ক্রন্দন, কেন এ ব্যাকুলতা? ইহাও কি শিশুর তাসের ঘর ভাঙায় ক্রন্দনের সমতুল্য নয়? যদি তাহাই হইল, তবে এ ব্যাকুলতাও ত হাস্যকর। কিন্তু এ মায়াই বা কেন? এ মোহই বা কেন? ইহার

কারণ কি, তাহা কে বলিবে? আর ভগবান্‌ই বা এ ক্রীড়া পুত্তলি ও তাসের ঘর দিয়া মানবকে মজাইলেন কেন, তাহাই বা কে বলিবে? তবে কি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত? অভিপ্রেতই যদি হইবে, তবে ইহাতে এত দুঃখ কষ্ট হতাশার যন্ত্রণা কেন? এবং এই সুখকর মোহে যে ডোবে, সে তাঁকে পায় না কেন? যিনি মানবের সর্ব্বসুখদাতা ও সর্ব্বমঙ্গলের আকর, তাঁহাকে লাভ করাইত মানবের মোক্ষসুখ। যে ক্রীড়া তাঁহাকে লাভ করার পক্ষে অন্তরায়, সে ক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? কেন এ তাসের ঘর—কেন এ ভবের খেলা? ইহাতে স্বতঃই মনে হইবে যে, এই ক্রীড়ায় অবশ্য তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত আছে। তাহা কি? তাহা বুঝিবার জন্য ত কত জ্ঞানী, কত মনস্বী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বুঝিয়াছেন এই যে, এই তাসের ঘরে পুতুলক্রীড়ায় একবারে আত্মহারা না হইয়া, আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে, এই ভবের খেলা খেলিবে, এই মায়া মোহের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও যে ইহার বিষময় বায়ুতে বিষাক্ত না হইবে, সেই তাঁহাকে পাইবে। তবে এই তাসের ঘরও মানবের পক্ষে কর্ত্তব্যসাধনের প্রকৃষ্ট পথ। এই তাসের ঘরে থাকিয়া ও পুতুল খেলা খেলিয়া যাহাতে শুধু ইহাতে না ডুবিয়া যাই, দৈববশে তাসের ঘর ভাঙ্গিলে মুহ্যমান হইয়া না পড়ি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ইহা অন্তরে জাগরূক রাখিলে কালে আমরা কি মোক্ষসুখ লাভে সমর্থ হইব না?

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

গৃহ-কর্ম্ম।

বোঁদের পায়স।

দ্রব্য।

ছোলার ডালের বেশনের চিনিহীন বোঁদে	৵৷৹ সের
খাঁটি দুগ্ধ	৴৩ সের
চিনি দোবারা	৵৬০ পোয়া
বাদাম পেস্তা কিসমিস ছোট এলাচচূর্ণ কর্পূর	সম্ভব মত।

প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

যদি ঘরে বোঁদিয়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভালই, নতুবা ময়রার দোকান হইতে আল বোঁদে (অর্থাৎ চিনির রসে না ফেলা) টাটকা ভাজাইয়া আনাইয়া প্রস্তুত রাখ। দুধ জ্বালে ফুটিয়া ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল বোঁদিয়া ঢালিয়া দেও। অল্প-ক্ষণ ফুটিলে তাহাতে চিনি দেও, তাহার

পর সমস্ত উপকরণ দিয়া নাড়িতে থাক। যখন পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, তখন তাহাতে এলাচিচূর্ণ এবং কর্পূর নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া রাখ। ইহা অন্নোষ্ণ সেবন করিলে অনুপম আস্বাদন অনুভূত হয়। রসনা-পরিতৃপ্তিকর দ্রব্যের মধ্যে ইহা একটী প্রধান সামগ্রী।

দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভা ১৯শে ফেব্রুয়ারি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বড়লাট উপস্থিত থাকিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডি এল উপাধি দিয়া সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে অনেকগুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালী রমণী উপস্থিত ছিলেন। কুমারী হেমপ্রভা বসুর এম্ এ এবং আইডা ডিক্রুজের বি এ উপাধি লইবার সময় বিশেষ আনন্দধ্বনি হয়। বাইস চ্যান্সেলার ট্রিবেলিয়ান সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২। বেথুন কলেজের পারিতোষিক দান সভারও খুব সমারোহ হইয়াছিল। লেডী এলগিন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। মেঃ বি, এল গুপ্ত জেলা ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৪। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ মহীমোহন ঘোষের সহিত স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমীলার শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। সিন্ধু ও কট্রী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী ২১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৬। রাজপ্রতিনিধি আগামী ২৯শে মার্চ কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করিবেন।

৭। বিলাতে ৬৪টী ছাত্র বারিষ্টার হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ১৫টী এ দেশীয়।

৮। গত ৮ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় ভারতের অনেক কথা আছে। দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ, মড়ক বৃদ্ধির জন্য আক্ষেপ, সীমান্ত যুদ্ধের বীরদিগের বীরত্বের ধন্যবাদ আছে।

৯। ডাক্তার এ করার নেপাল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

১০। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে আজি কালি সাহেব বিবী এবং বাঙ্গালী বাবুদের বাইসিকেলভ্রমণ দেখা যায়। কলিকাতায় নাকি ৪০০০ বাইসিকিলের আমদানী হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ম্যাজিক কালী—পি এল মুখার্য্যির প্রস্তুত কালী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নূতন পেনে জলের মত এই কালী লইয়া কাগজে লিখিলে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু তাহা শুকাইয়া আগুন তাতে ধরিলে দিব্য সবুজ রঙের লেখা বাহির হয়। ইহার মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ ছয় আনা।

সারস্বত পঞ্জিকা—ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৩০৫ সালের এই পঞ্জিকার একখণ্ড উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহাতে জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ আছে। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বামারচনা।

আমার খুকু।

আয়রে আয়রে মোর হৃদয়-রতন।
শান্তিরূপা খুকুরাণী দেব-দরশন ॥
হাসির লহরী ছুটে তোর মুখ দিয়ে।
আনন্দ ঢালিয়া দেয় হৃদয় ভরিয়ে ॥
অমৃত-মাখান মুখ নাহিক তুলনা।
যত দেখি তত হয় দেখিতে বাসনা ॥
ধরিয়া তোমারে বুকে স্বর্গসুখ পাই।
মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিবে আছি ভুলিয়া তা যাই ॥
ধরাতলে যত কিছু আছে মনোহর।
আমার খুকু রে ! তুমি তা'হতে সুন্দর ॥
লোকে না বলুক ভাল তাহে নাই ক্ষতি।
মোর চক্ষে খুকুরাণী ভুবনের জ্যোতি ॥
ঈশ্বরের করুণার এক বিন্দু লয়ে।
গঠেছে বিধাতা তোরে একফোঁটা মেয়ে ॥
নাহিক তুলনা তোর—জগতে অতুল।
দেবতার কৃপাকণা আশীর্ব্বাদি ফুল ॥
পৃথিবীর পাপ তাপ দুঃখ ও যন্ত্রণা।
ছুঁইতে না পারে তোরে ইহাই কামনা ॥
দেব-আশীর্ব্বাদ লয়ে চিরজীবী হও।
দুঃখময় হৃদে মোর শান্তি ঢেলে দাও ॥

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী,
ঝিনাইদহ।

সরলা সুন্দরী।

মুছিয়া ফেলেছে তার সীমন্তে সিন্দুর,
কাড়িয়া লইয়া গেছে বাজু, বালা, হার,
মুড়াইয়া দিয়া চারু চাচর চিকুর,
যৌবনে যোগিনী-বেশ করিয়াছে তার।
একাহার, হবিষ্যান্ন, দিনান্তে বিধান,
একাদশী, ব্রহ্মচর্য্য সব তারি তরে;
নাহি সুখ, নাহি শান্তি, মরুময় প্রাণ,—
সরলা বিধবা আজ ভারত-ভিতরে!